Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা আক্তার

রোলঃ 227021439

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা আক্তার

রোলঃ 227021439

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমেনা আক্তার, আইডিঃ 227021439 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আমেনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আমেনা আক্তার

আইডিঃ 227021439

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে অসীম নেয়ামত দান করেছেন।আমি তাঁর সাহায্য,ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তিনি তাঁর নিয়ামাতকে তার বান্দাদের ওপর পরিপূর্ণ করেছেন, ফলে তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, যাঁর কোনো শরিক নেই-যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন।
মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা বেশ পুরোনো, বলা যায় যেদিন থেকে মানবজীবনের সূচনা সেদিন থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু।
হাসান বিন সালেহ (রহ.) বলেন

إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشر

অর্থঃ শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

শয়তান মানুষকে বিভিন্ন পন্থায় ধোঁকা দেয়। তার কতক পন্থা এমন, যা সু-স্পষ্ট ও পরিস্কার। পক্ষান্তরে তার কিছু পন্থা এমন, যা সাধারণ মানুষতো বটেই বহু আলেমের নিকটও তা অস্পষ্ট। আর এটাই হচ্ছে তার নেক সুরতে ধোঁকা দানের পন্থা।
শয়তান মানুষের জন্য সব সময় ফাঁদ পেতে রাখে।দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত মানুষ গুলো না বুঝে বা বুঝে এই ফাঁদে পড়ে যায় এবং বিভিন্ন অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।কিন্তু শয়তান এতে ক্ষান্ত হয় না সে চায় যারা আখিরাতের ফিকির করে তাঁদেরকে ও এই ফাঁদে ফেলতে।তাই তো শয়তান তার দল সহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় আগমনের পর থেকে মানবজাতি এক আল্লাহর এবাদত করতো, তার সাথে কাউকে শরীক করতো না। ফলে শয়তানও যতভাবে তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতো ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতো। শয়তান মানবজাতির মাঝে তার ধোঁকার জাল নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে। আর তা এভাবে, মানবজাতির শুরুলগ্নে যখন নেককার লোকদের ইন্তেকালে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনরা শোকাতুর হতো শয়তান তখন তাদের কাছে গিয়ে বলতো, তোমরা তার জন্য

ভাস্কর্য নির্মাণ করো, তাহলে তোমাদের মাঝে তার স্মরণ চিরস্থায়ী হবে এবং নেককার লোকদের স্মরণে তোমাদের সওয়াবও অর্জিত হবে। ফলে শয়তানের নেক সুরতে এরূপ প্ররোচণার এক পর্যায়ে তারা পিতৃপুরুষের ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু করে। এভাবে শয়তান তাদেরকে এমনসব কাজে উদ্বুদ্ধ করে যা তারা নেক কাজ ভেবে করতে শুরু করে অথচ এটাই ছিলো তাদের গোমরাহিতে প্রবেশের প্রধান দ্বার। ফলে ক্রমান্বয়ে মানুষ শিরক্ বিদআতসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কুরআনের মাধ্যমে শয়তানের সকল কুমন্ত্রণার সর্ম্পকে সতর্ক করেছেন।তাই আমাদের উচিত কোরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া তাহলে শয়তানের ধোকা থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।

শয়তানের পরিচয়

শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। শয়তান জীন জাতির অর্ন্তভুক্ত।শয়তান জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে সে আল্লাহর ইবাদত করত। আকাশে ফেরেশতাদের সাথে থাকত এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তাকে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার আদেশ দিলেন, সে তখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করল। অহংকার করে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। একটি মানব শিশু পৃথিবীতে ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে শয়তান তার পিছনে কাজ করতে শুরু করে।শয়তান হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তাগুত।তাগুত শব্দের অর্থ অবাধ্য, সীমালঙ্ঘনকারী।

শয়তান শব্দটির আরব ও অনারব দুটো মূল সূত্র আছে। আরব-সুত্রে শব্দটির মূল হতে পারে দুটো-একটা "শাইত" "شيط আর আরেকটা "শাতান" شطن | "শাতান" শব্দটির অর্থ (তাবা'আদা) অর্থাৎ এমন একজন যে অনেক পথ পারি দিয়ে বহু দূরে চলে গেছে। এই কারণেই শাতান বলতে অনেক লম্বা একটি দড়িকেও বোঝানো হয়। বিশাল লম্বা দড়িকে বলা হয়(حبل ممتد)হারুন মুমতাদ্দ অথবা আশ-শাতান الشطن। এখান থেকেই আমরা শয়তান শব্দটি পাই।

শয়তানের একটি নাম হলো ইবলিস। তাকে ইবলিস বলে নামকরণের কারণ হলো, সে আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ।

শয়তান মানুষের সরাসরি ও প্রকাশ্য দুশমন।মানুষকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিতে শয়তান আল্লাহর কাছে ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে। শয়তান বনী আদমের শিরায় উপশিরায় চলতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, 'অবশ্যই শয়তান আদমসন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৮৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৭৪)

পৃথিবীর সকল ভাষার প্রায় সকল মানুষই শয়তানকে শয়তান নামেই চেনে এবং ডাকে।সে সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে। সে মানুষের মনের মধ্যে মন্দ কাজ করার জন্য প্রলুদ্ধ করে।

শয়তানের উদ্দেশ্য

শয়তান হল মানবজাতির চিরশত্রু। অবিশ্বাস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা এই তিনটি হচ্ছে শয়তানের জীবনের মূল উদ্দেশ্য।তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়া।সে চায় সকল মানুষ জাহান্নামী হয়।সে মানুষের অগোচরে থেকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।আল্লাহর কাছ থেকে শয়তান মানুষের অগোচরে থাকার ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে। শয়তান ততক্ষণ পর্যন্ত কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সফল হয়।সে মানুষকে শুধু কুমন্ত্রণাই দেয় না যখন দেখে কাজ হচ্ছে না তখন নেক সুরতে ধোকা দিয়ে থাকে।এই কাজে কখনও সে সফল হয় আবার কখনও বিফল হয়।আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া ক্ষমতা গুলো সে কাজে লাগিয়ে অনেক মানুষকে খারাপ কাজে লিপ্ত করেছে।শয়তান কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।সে মানুষের মনের মধ্যে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে মানুষকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করে।সে মানুষকে সব সময় জাহান্নামে নিতে চায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين অর্থঃ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[সূরা বাকারাহ-(২০৮)]

শয়তানের কুমন্ত্রণা

কুমন্ত্রণা হলো মানুষের মনের কোনায় শয়তানের জাগ্রত করা বিভিন্ন রকমের ভাবনা,যা ইবাদতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সন্দিহান ও পেরেশান করে তোলে।শয়তানের কুমন্ত্রণার কারনে মানুষ ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত হয়।

মানব জাতির সূচনা থেকেই শয়তান মানুষের নিকৃষ্ট শত্রুর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।ইবলিশ ও তার বাহিনী সবসময় মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরাতে সচেষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান হাতিয়ার হল কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা।

শয়তান মানুষের অন্তরে বিভিন্নভাবে কুমন্ত্রণা দেয়।সে মানুষের অগোচরে থেকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

শয়তানের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি হলো, যখন মুসলিমরা পবিত্রতা (ওজু) ও সালাতের মতো বিভিন্ন আমল পালন করার ইচ্ছা করে, তখন সে এই ব্যাপারে তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সে তাদেরকে সুন্নাহ'র অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাদের অন্তরে এই ভাবনা জাগ্রত করে যে, সুন্নাহ-প্রদত্ত শিক্ষা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যথেষ্ট নয়। যার ফলে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াব বৃদ্ধির আশা করে। বস্তুত এভাবে (নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে) তারা (আমলের) সওয়াবের হ্রাস ঘটায় বা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলে।

কারও কারও থেকে আযহারি এ বর্ণনা করেছেন, “শয়তান আল্লাহ তাআলাকে শপথ করে বলেছিল,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

'সে বলল, তোমার ক্ষমতার শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়ব।'[সূরা সোয়াদ(৩৮)]

নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষকে মন্দ চিন্তা ও অন্তরের লোভ-লালসা পূরণের দিকে আহ্বান করে। তার অনুসারীরাই তাকে মেনে চলে, তার ডাকে সাড়া দেয় এবং তার আদেশ পালন করে। এমন লোকেরা নবিজি-এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে। তাদের কেউ কেউ মনে করে, যদি সে নবিজি এ-এর মতো ওজু করে এবং তাঁর মতো করে ধোয়, তা হলে হয়তো নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবে না!কুরআনে আছে ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে বলেছেন-

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

অর্থ:হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না,নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।(সূরা-মারইয়াম আয়াত-৪৪)

মানুষের ওপর শয়তানের আক্রমণের কৌশল

আল্লাহ তাঁর শত্রু ইবলীসের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে আদম-কে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে? তখন ইবলীস যুক্তি দেখাল, সে আদম-এর থেকে উত্তম। ফলে সে অভিশপ্ত হলো এবং অভিশপ্ত হবার পর সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল। আল্লাহ যখন তাকে অবকাশ দিলেন, তখন সে বলেছিল,

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لا فَعْدَنَّ لهم صرطك المستقيم . ثم لانيلَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خلفهم وعن أينهم وعن شمايلهم ولا تجد أكثرهم شكرين(

"সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে, তাদের পিছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে না।[সূরা আ'রাফ(০৭)]

ইবনু কায়্যিম বলেন, "মানুষ এই চারটি পথের যে-কোনো একটি পথেই চলে।
অন্য কোনো পথে চলে না। সে তার ডান, বাম, সামনের বা পিছনের পথ থেকেইযে-কোনো একটি পথ বেছে নেয়। সে প্রত্যেক পথেই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দানকারীহিসেবে পায়। কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলতে গিয়ে এইপথগুলোর যে-কোনো একটি পথে চলে, তখন সে শয়তানকে প্রতারক হিসেবে,আল্লাহর পথে বাধাদানকারী হিসেবেই পাবে। কিন্তু সেই মানুষটি যদি যে-কোনো
একটি পথকে পাপ কাজের জন্য বেছে নেয়, তা হলে শয়তান তাকে উৎসাহিত করবেআর পাপে লিপ্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ দেবে।
ইবলীস শপথ করেছিল যে, আদম-সন্তানের সবাইকে সে বিপথে পরিচালিত করবে, যেন তারা পূর্ববর্তী মানবসভ্যতার (খারাপ) পরিণতির বর্ণনাসমূহ ও পুনরুত্থানের বিষয়কে অস্বীকার করে। আর লোকেরা যেন দৈনন্দিন আমল নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।
শয়তান বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। শয়তান হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সাথে প্রতারণা করেছে।তাঁরা এক সময় জান্নাতেই ছিল।তাঁরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছিল।কিন্তু এটা শয়তানের সহ্য হয় নি।তাই সে কৌশলে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়ে তাঁদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় অবতরণ করতে বাধ্য করে।

মানুষ এক আল্লাহর উপাসনা করে জান্নাতে ফিরে যাক এটা শয়তান চায় না।তাই সে কৌশলে নূহ(আ.) এর জাতিকে দিয়ে তাদের আগের কিছু নেক বান্দার মূর্তি বানিয়ে রাখতে কুমন্ত্রণা দেয়।একসময় তাদেরকে শিরকে লিপ্ত করে দেয়।

শয়তান প্রথমে মানুষকে দিয়ে কুফর ও শিরক করাতে চায়।যদি তা করাতে না পারে তখন বিদআত করাতে চায়।এটাও যদি না করাতে পারে তখন কৌশলে বড় গুনাহ করানোর চেষ্টা করে।যদি তাও না পারে তখন ছোট গুনাহ করাতে চায়। এটাও বিফলে গেলে অনুমোদিত কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। যদি তাও না করতে পারে তখন কৌশলে কম সওয়াব হয় এমন কাজ করানোর চেষ্টা করে।এভাবে শয়তান কৌশল করে মানুষ কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সবসময় কাজ করতে থাকে।

নেক সুরতে ধোকা দানের বিবরণ

শয়তান মুমিনদের ধোকায় ফেলার চেষ্টা করে থাকে।কিন্তু মুমিনরা সবসময় ইবাদত করে বলে সহজে তাদের কাবু করতে পারে না।এক্ষেত্রে সে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশল হলো নেক সুরতে ধোকা। মালেক বিন দীনার বলেন, তোমরা এমন এক ধোঁকাগ্রস্ত যামানায় বসবাস করছো একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরাই সে ধোঁকা বুঝতে পারে। তোমাদের যামানা এমন যাতে পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিথ্যার প্রবণতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলে তারা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করেছে। সুতরাং তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো, যেন তাদের ধোঁকার জালে তোমাদের ঈমান বরবাদ না হয়। একজন মুমিনের পিছনে শয়তান সবসময় লেগে থাকে। কারণ একজন সাধারন মানুষ যে কোন গুনাহের কাজ অসতর্কতার জন্য করে ফেলে।কিন্তু একজন মুমিন সবসময় শয়তানের কুমন্ত্রণার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে।তাই তাদের কাবু করতে শয়তান নেক সুরতে ধোকা দিয়ে থাকে। শয়তান আমাদের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে ধোকা দিয়ে থাকে যেমন: পোশাকের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে,পবিত্রতার ক্ষেত্রে, বিবাহের ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে, সফরের ক্ষেত্রে,পানাহারের ক্ষেত্রে, আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

পোশাকের ক্ষেত্রে

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, প্রথম যুগের সুফিরা যখন শুনলো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাপড়ে তালি যুক্ত করতেন এবং আয়েশাকে (রা.) বলেছেন, কাপড়ে তালিযুক্ত করার পূর্বে তা পরিধান থেকে বিরত হয়োনা। আর তারা একথাও শুনলো যে, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাপড় তালিযুক্ত ছিলো এবং ওয়ায়েছ করনী ময়লা ফেলার স্থান থেকে কাপড়ের টুকরা কুড়িয়ে তা ফোরাত নদীতে ধৌত করতেন, অতঃপর তা দ্বারা কাপড় তালিযুক্ত করে সে কাপড় পরিধান করতেন। তাই এসব সুফিরাও ভুল কিয়াসের বশীভূত হয়ে নিজেদের জন্য তালিযুক্ত কাপড় নির্বাচন করে। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। কেননা রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ জরাজীর্ণ অবস্থাকে প্রাধান্য দিতেন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা হেতু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকতেন, আর তাদের অধিকাংশই দারিদ্রতার কারণে তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এতো প্রথম যুগের সুফিদের অবস্থা। পক্ষান্তরে এ যুগের সুফিদের অবস্থা হলো, তারা বিভিন্ন রঙের দু'/তিনটি কাপড় ক্রয় করে সেগুলোর বিভিন্ন স্থানে ফুটা করে তাতে তালিযুক্ত করেন। ফলে তাদের এ কাপড় দু'টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেঃ- প্রথমতঃ প্রসিদ্ধি আর দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা এ ধরনের তালিযুক্ত কাপড় বহু লোকের নিকট রেশমী কাপড় থেকেও অধিক প্রিয়। এসব কাপড় পরিহিত ব্যক্তি মানুষের নিকট জাহেদ হিসাবে পরিচিত হয়।

আচ্ছা বলুনতো, এরা কী শুধু তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেই পূর্বসূরিদের মতো হয়ে যাবে? অথচ তারা এমনটিই ধারণা করে। আর ইবলিসও তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তোমরাতো সুফি।

কেননা সুফিদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করবে, আর তোমরাতো তালিযুক্ত কাপড়ই পরিধান করছো।

অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
عن سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البسوا الثياب البيض فأنها أظهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم قال الترمذي هذان حديثان صحيحان

অর্থঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা প্রকাশ্যতর এবং উৎকৃষ্টতর, এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফনের ব্যবস্থাও সাদা কাপড় দ্বারাই করো। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত হাদীসদ্বয় বিশুদ্ধ।

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, সাদা পোশাক পরিধান করাকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো আমাদের নিকট সর্বোত্তম।

সূফী সম্রাট মুহাম্মদ বিন তাহের তার কিতাবে উল্লেখ করেন, রঙিন কাপড় পরিধান করা সুন্নাত। দলীল স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেট রঙিন কাপড় পরিধান করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা অস্বীকার করছিনা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল কাপড় পরিধান করেছেন
এবং এ কথাও বলছিনা যে, তা পরিধান করা অবৈধ। বরং হাদীসেতো এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাল রেখা বিশিষ্ট ইয়ামেনী চাদর মুগ্ধ করতো। কিন্তু সুন্নাতের বিধানতো ঐ বিষয়ের সাথেই খাছ যে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেও অব্যাহতভাবে তার উপর আমল করেছেন।

আর সাহাবায়ে কেরামতো লাল কালো রঙয়ের কাপড়ও পরতেন। তবে অতিরিক্ত মোটা কাপড় ও তালিযুক্ত কাপড় যেহেতু প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ তাই এগুলো পরিধানের উপর শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, তালিযুক্ত মোটা কাপড় পরিধান করা আমার নিকট চার কারণে অপছন্দনীয়ঃ-
প্রথমতঃ তালিযুক্ত কাপড় আমাদের পূর্বসূরীদের পোশাক নয়, বরং প্রয়োজনের মুহূর্তেই আমাদের পূর্বসূরীরা কাপড় তালিযুক্ত করতেন।
দ্বিতীয়তঃ তালিযুক্ত কাপড় দরিদ্রতার ফরিয়াদকে অন্তর্ভুক্ত করে, অথচ মানুষকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে প্রকাশ করে।
তৃতীয়তঃ তালিযুক্ত কাপড় দুনিয়া বিমুখতার বিষয়টি প্রকাশ করে, অথচ আমরা তা গোপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।

চতুর্থতঃ তালিযুক্ত কাপড়ে শরীয়ত থেকে বিচ্যুত এসব লোকদের সাদৃশ্য রয়েছে, আর যে যাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।
ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন, "من تشبه بقوم فهو منهم"
অর্থঃ যে যাদের সাদৃশ্য অবলম্বন
করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।
নিন্দা করেন, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

হুসাইন বিন হিন্দ বলেন, আমি জা'ফর হাজ্জাকে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন বড়দের অন্তর থেকে উপকার লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছে তখন তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও তালিযুক্ত কাপড় নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে।
শয়তান সাধারণ মানুষকে পোশাকের সুন্নত থেকেও নিজের সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন: নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে বোরকা আজকের সময় একটি ফ্যাশনে পরিনত হয়েছে।পোশাকে থাকে অনেক নকশা যে নকশার কারনে পরপুরুষ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শয়তান বুঝায় তুমি তো পর্দা করেই চলছো।

বিবাহের ক্ষেত্রে

শয়তান মানুষকে সবসময় হারাম কাজে লিপ্ত রাখতে চায়।তাই সে বিবাহ বর্জন ও বিবাহ বিচ্ছেদের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।এখন মানুষ বিবাহকে এতো কঠিন করে ফেলেছে যে ছেলে মেয়েরা যিনায় লিপ্ত হয়ে যায়। আমাদের এখন এই সমাজে বিবাহের চেয়ে যিনা করা সহজলভ্য হয়ে গেছে। ইসলাম, নবীর সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানুষ শয়তানের ধোকায় পা দিচ্ছে। সমাজে মানুষ যিনাকে আর যিনাই মনে করছে না। আর যারা আল্লাহ ভীরু মানুষ তাদেরকে শয়তান বিবাহ বর্জনে উৎসাহিত করে। তাদেরকে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে বিবাহ হল একটি দুনিয়াবি কাজ। এটি মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হলে বিবাহ করা ওয়াজিব। যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে অধিকাংশ ফুকাহার মতানুসারে বিবাহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, এমন অবস্থায় বিবাহ সকল নফল এবাদত হতে উত্তম। কেননা তা সন্তানের অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قال عليه الصلاة والسلام : "تناكحوا تناسلوا" وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. "

অর্থঃ তোমরা বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে বংশ বিস্তার করো।

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উকাফ বিন বিশর তামিমী নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন হে উকাফ, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে উত্তরে বললো, না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি বাঁদী আছে? সে বললো, না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি ভালোভাবে সচ্ছল? সে উত্তরে বললো, হাঁ।
তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তো শয়তানের ভাই। তুমি যদি নাসারাদের দলভুক্ত হতে তাহলে তাদের পাদ্রী হয়ে যেতে। নিশ্চয় বিবাহ আমাদের সুন্নাত। অবিবাহিত ব্যক্তিরাই তোমাদের মাঝে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তোমাদের মৃতদের মাঝেও

অবিবাহিতরাই জঘন্যতম। নেককারদের মাঝে হামলা চালাতে বিবাহ বর্জনের চেয়ে বড় হাতিয়ার শয়তানের নিকট দ্বিতীয়টি নেই।

সুফিদের কতক বলে, বিবাহ দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, তাই বিবাহ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

সুফি আবু সুলাইমান দারানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে অথবা রিজিক অন্বেষণে সফর করে কিংবা বিবাহ করে তাহলে সে
দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হলো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তির পুরো কথাই শরীয়ত বিরোধী। কিভাবে হাদীস অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে, অথচ ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন! কেনই বা রিজিক অন্বেষণ করবে না।
আইয়ুব (আ.) দুঃখের সময় বিবাহ করেছেন এবং তার সন্তানও হয়েছে।

ইবরাহিম বিন আদাম বলেন, রুটির জন্য পিতার সামনে পুত্রের ক্রন্দন বহু নেক কাজ থেকেও উত্তম।

ইবলিছ বহু সুফির উপর নেক সুরতে ধোঁকা দানের মিশন চালিয়ে তাদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে তাদের পূর্ববর্তীরা এবাদতের ব্যস্ততার দরুন তা বর্জন করেছে এবং বিবাহকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে অন্তরায় মনে করেছে। এসব সুফিদের বিবাহের প্রয়োজন কিংবা বিবাহের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা বিবাহ থেকে

বিরত থেকে নিজেদের দেহ ও ধর্মের ক্ষতি করেছে। আর বিবাহের
প্রয়োজন যাদের ছিলো না তারা বিবাহের ফযীলত থেকে বঞ্চিত
হয়েছে। বুখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে
বর্ণিত হাদীছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ " وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر" قالوا نعم قال: "وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" ثم قال: "أفتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير"

অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেকের গোস্ত খণ্ডেও সদকা রয়েছে। সাহাবারা বললেন, আমাদের কেউ যদি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে তাহলে

তাতেও কি তার সওয়াব হবে! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা বলো তো; যদি সে তার চাহিদা হারাম পন্থায় পুরা করে তাহলে কি তার গুনাহ হবে? তারা বললেন, হাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অনুরূপভাবে যদি সে তার চাহিদা হালাল পন্থায় পুরা করে তাহলে তার সওয়াব হবে।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি গুনাহের হিসাব করো নেকির হিসাব করো না!

সুফিদের কতক বলে, বিবাহ স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে আবশ্যক করে, আর ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক, আর উপার্জনতো এক কঠিন কাজ। এভাবে শয়তান নেক সুরতে ধোকা দিয়ে থাকে।

আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে

মানুষের যে কোন কাজে শয়তান তাকে আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে বিপথে নেয়ার চেষ্টা করে। দেখা যায় কোন আলেমের প্রতি আমরা আবেগে বশীভূত হয়ে তার প্রতি অন্ধভক্ত হয়ে যাই। সে বিপথে গেলেও আমরা তার ভুল মানতে চাই না এবং তাকেই অনুসরণ করতে থাকি। কখনো কখনো আবেগে পড়ে আমরা বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ (রহ.) বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, আমাকে ইবনে আদম বলেছেন, আমি হামজা যায়্যাতকে বলতে শুনেছি, তিনি সুফিয়ান সাওরীকে (রহ.) জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা বলে যে, রাবি বিন খাইসাম কোরআন শ্রবণ করে চিৎকার দিয়েছেন। তখন সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, কে এমনটি বর্ণনা করে, এটাতো সেই গল্পকার ঈসা বিন সুলাইমের কাজ। আমি তখন ঈসা বিন সুলাইমের সাক্ষাতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ ঘটনা কার থেকে বর্ণনা করো? তখন সে তা বর্ণনার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এই যে সুফিয়ার সাওরী (রহ.) তিনি স্বয়ং অস্বীকার করছেন, রাবি বিন খাইসাম থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশ পায় নি। কেননা রাবি বিন খাইসাম ছিলেন সাহাবাযুগের লোক, আর সাহাবাদের কারো থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশ পায় নি, এমনকি তাবেঈদের থেকেও না। এতদ্বসত্ত্বেও আমরা যদি তাদের দাবি অনুপাতে ঘটনার সত্যতা মেনেও নেই তাহলে বলবো, কখনো কখনো মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এতটাই নীরব হয় যে, লোকেরা তাকে মৃত ভাবে। আর কোরআন তেলাওয়াত কিংবা আখেরাতের আলোচনা যার অন্তরে এই স্তরের ভয় সৃষ্টি করে তার সত্যবাদিতার নিদর্শন হলো, যদি এই ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত কিংবা আখেরাতের আলোচনা দেয়ালের উপর আরোহী অবস্থায় শ্রবণ করে তাহলে সে বেহুশ হয়ে অবশ্যই দেয়াল থেকে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ভাবাবেগের এরূপ স্তরে উন্নীত হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও দেয়ালে আরোহী অবস্থায় তেলাওয়াত শ্রবণ করে সেখানে অবিচল বসে থাকে, আর সমতল ভূমিতে কোরআন শ্রবণ কিংবা আখেরাতের আলোচনা শ্রবণকালে আবেগপ্রবণতায় কাপড় বিদীর্ণ করে কিংবা শরীয়তে অপসন্দনীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে তাহলে তার ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত ফতোয়া দিচ্ছি, শয়তান তাকে নিয়ে খেলা করছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালো করে শুনুন! আল্লাহ আপনাকে বুঝার তাওফীক দান করুন। সাহাবারা ছিলেন সর্বাধিক নিস্কলুস-পবিত্র অন্তরের অধিকারী। আবেগপ্রবণতায় তাদের থেকে সর্বোচ্চ ক্রন্দন কিংবা বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। কতক অপরিচিত সাহাবা থেকে আমরা যে বিষয়ের নিন্দা করেছি এ জাতীয় কিছু প্রকাশ পেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় তাকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

হাসান বিন আলী আহমদ বিন জা'ফরের সূত্রে, তিনি আবদল্লাহ বিন আহমদের সূত্রে, তিনি তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি রাওহের সূত্রে, তিনি সারী বিন ইয়াহইয়ার সূত্রে, তিনি আবদুল করিম বিন রশীদের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি হাসান বসরীর (রহ.) মজলিসে উপস্থিত থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি (ওয়াজ শ্রবণকালে) উঁচু আওয়াজে কাঁদলে হাসান বসরী (রহ.) বলেন, এখন এ ব্যক্তিকে শয়তান কাঁদাচ্ছে।

ইবরাহিম বিন রাহমুন ইসহাক বিন ইবরাহিমের সূত্রে, তিনি আবু সফওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ফুযায়েল বিন ইয়াযের (রহ.) পুত্র (ওয়াজ শ্রবণকালে আবেগপ্রবণতায়) পড়ে গেলে ফুযায়েল বিন ইয়ায (রহ.) তাকে বলেন, হে বৎস! তোমার আবেগ যদি সত্য হয় তাহলে তো নিজের বিষয়টি তুমি লোক সম্মুখে প্রকাশ করলে, আর তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে নিজেকে তুমি ধ্বংস করলে।

আবু বকর বিন হাবীব আবু সা'দ বিন আবু সাদেকের সূত্রে, তিনি ইবনে বাকুয়ার সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আহমাদ নাজ্জারের সূত্রে, তিনি মুরতাইশের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি ওয়ায়েজ আবু ওসমান সাঈদ বিন ওসমানের সামনে এক ব্যক্তি আবেগে আওয়াজ করলে তাকে বলতে শুনেছি, তোমার এ আবেগ যদি সত্য হয় তাহলেতো নিজের সব বিষয় তুমি প্রকাশ করলে, আর তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তুমি আল্লাহর সাথে শিরক্ করলে।

সফর ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে

সফর ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইবলিশ নানা কৌশলে ধোকা দিয়ে থাকে।
আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভ্রমণের ব্যাপারে ইবলিশ লোককে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়েছে । ফলে তাদের উদ্বুদ্ধ বহু করেছে এমন ভ্রমণের ব্যাপারে, না ছিলো যার স্থান নির্দিষ্ট আর না ছিলো তাদের ইলম অন্বেষণের কোন উদ্দেশ্য। বরং তাদের অধিকাংশ পাথেয় বিহীন একাকী ভ্রমণ করে নিজেকে মুতাওয়াক্কিল দাবি করে। তারা এ কাজের দরুন অগণিত ফযিলত থেকে বঞ্চিত এবং ফরয পালনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর ওলি হিসাবে ধারণা করে। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা এ কাজের দরুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত উপেক্ষা করে নাফরমানদের কাতারে শামিল হচ্ছে।

অনির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করা নিন্দিত হওয়ার কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রয়োজনে যমীনে ভ্রমণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। দলীল স্বরূপ আমরা মুসলিম বিন তাউসের হাদীস উল্লেখ করছিঃ-

عن مسلم عن طاوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام

অর্থঃ মুসলিম বিন তাউস বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নাকে রশি বাঁধা, আংটা পড়া, বৈরাগ্যবাদ এবং দেশ ত্যাগ করে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমানোর বিধান ইসলামে নেই।

অতএব; যে ব্যক্তি সফরকে তার অভ্যাসে পরিণত করলো সে নিজ জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট এবং দৈহিক শাস্তি প্রদানকে একত্রিত করলো, আর এ দুটোই ভ্রান্ত উদ্দেশ্য।
ইসলামে কখনোই কোনো মানুষকে সারাজীবন সফরে থাকতে বলে নি।

আহমদ বিন হুসাইন বিন হাসান বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে পাথেয় বিহীন মরুভূমি সফর করতে চায়। তিনি তখন তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন; না, না, পাথেও, সাথী-সঙ্গী এবং কাফেলাবদ্ধ ব্যতীত সফর করা উচিৎ না।

আবু বকর মারুযী বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) নিকট এসে বললো, এক লোক সফরের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং কোন ধরনের সফর আপনার প্রিয়? পাথেয় সাথে

নিয়ে সফর করা নাকি পাথেয় বিহীন আল্লাহর উপর ভরসা করে সফর করা? তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, পাথেয় সাথে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, যেন মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়।

ইবরাহিম বিন খলীল বলেন, আমাকে আহমদ বিন নসর বলেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বললো, এক লোক সাথে কোন পাথেয় না নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করতে চায়। তিনি বললেন, তার বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করে না। যদি সে পাথেয় নাই নেয় তাহলে কোথা হইতে সে আহার করবে? আহমদ বিন নসর বললো, সে আল্লাহর উপর ভরসা করবে তাহলে মানুষ তাকে খাদ্য দিবে। আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি মানুষ তাকে না দেয় তাহলে কি সে মানুষের দ্বারস্থ হবে না, যেন মানুষ তাকে দেয়।

আমাকে এমন বিষয় মুগ্ধ করে না। আমার জানা মতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা এবং তাদের অনুসরণধন্য তাবেঈদের কেউ এমনটি করে নি।

বিনয়ের ক্ষেত্রে

আল্লাহর ভয় অন্তরে বিদ্যমান থাকলে বাহিরে কোমলতা এবং বিনয়তা প্রকাশ পায়। মানুষ তা চেপে রাখতে পারে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কিন্তু এটা গোপন করিয়া রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন দিনের বেলায় হাসতেন আর রাতে কাঁদতেন। আমাদের এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আলেমগণ জনসাধারণের মধ্যে বসে চপলতা প্রকাশ করবে। বরং এটাতে তাদের অসুবিধাই হবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন-যখন তোমরা ইলম সম্বন্ধে আলোচনা কর তখন তোমাদের গাম্ভীর্য রক্ষা করিও। এলমকে হাসি-ঠাট্টার সাথে মিলিত মিশ্রিত করো না-যার ফলে জনসাধারণ সেটা অন্তর হতে দূর করে দেয়। এটা রিয়া নয়। অবশ্য কৃত্রিম গাম্ভীর্য এবং কোমলতা প্রকাশ করা রিয়া।

কোন একজন ইবরাহিম নাখঈকে (রহ.) বললো, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন, তখন তিনি তা অপছন্দ করেন এবং ক্ষুব্ধ হন।

বিনয় ও লজ্জার ভানকারীদের কতক এমনও আছে, যারা আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকায় না। অথচ তাদের জানা নেই যে, এটা কোন ফযিলতের বিষয় নয়। কেননা কোন বিনয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয়ের ঊর্ধ্বে নয়। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন,

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها وقد قال الله تعالى: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَقَالَ { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض}

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে আকাশের দিকে তাকাতেন।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আকাশের দিকে তাকানো মুস্তাহাব। কেননা আকাশে শিক্ষণীয় আল্লাহর অগণিত নিদর্শন রয়েছে।

স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন,

أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا ها-

উপরে আসমান কি তারা দেখে না যে, আমি তা কিভাবে তৈরী করেছি?

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা অবলোকন করো।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলতেন, আমার যে আমল প্রকাশ পেয়েছে তা আমি অভ্যাসে পরিণত করবো না।
তিনি তার এক শিষ্যকে লোক সম্মুখে নামাজ পড়তে দেখে বলেন, তোমাকে লোক দেখিয়ে নামাজ পড়তে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করলো!

মুহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহ.) বলেন, আবু উমামা (রা.) এক ব্যক্তিকে সিজদারত অবস্থায় অতিক্রমকালে বললেন, যদি এ সিজদা তোমার ঘরে হত তাহলে কতইনা উত্তম হত!

হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন এক ব্যক্তিকে মাথা ঝুঁকাইয়া বসে থাকতে দেখে বলিলেন- ওহে তোমার মাথা উঠাও। কেননা, অন্তরে যেই পরিমাণ বিনয়তা আছে বাহিরে সেটার চেয়ে বেশী প্রকাশ করো না। আর যেই ব্যক্তি অন্তরের বিনয়তার চেয়ে বাহিরে বেশী বিনয়তা প্রকাশ করে সে কপটতার উপর কপটতা প্রকাশ করে থাকে।

ওজু ও পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে

ওজু ও পবিত্রতা অর্জন হল সালাতের প্রথম শর্ত। তাই শয়তান অজুর ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে।অজুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায়।

নিয়ত হচ্ছে কোনো কাজের পেছনের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর স্থান অন্তরে, জিহ্বার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নবি এবং সাহাবিগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা প্রতিটি কাজেই নিয়ত করতেন। যেসব শব্দসমষ্টি ওজু ও সালাতের আগে পড়ার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলো শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে জনগণের মাঝে বিবাদের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শয়তান সর্বদা তাদের শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাই আপনি তাদের কষ্টের সাথে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে দেখবেন; যদিও তা সালাতের অংশ নয়; বরং নিয়ত হচ্ছে কোনো কাজের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মনের সংকল্প। কেউ যখন ওজু করতে বসে, তখন তার ওজুর নিয়ত হয়ে যায় এবং কেউ যখন সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন তার সালাতের নিয়ত সম্পন্ন হয়ে যায়।

উবাই ইবনু কাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবি(স.) বলেছেন,

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا ، يُقَالُ لَهُ : الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ

"ওজুর সময় (সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি করার জন্য) একটি শয়তান রয়েছে। তার নাম 'ওয়ালাহান'। অতএব, (ওজুর সময়) পানির ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাক।"[আস সুনান, ইমাম তিরমিজি]

শয়তানের কুমন্ত্রণার একটি নষ্ট দিক হচ্ছে, এটি একজনকে প্রয়োজনের তুলনার বেশি পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষ করে যখন তা অন্যের কিংবা হাম্মামের পানি নয়।

উম্ম সা'দ বর্ণনা করেছেন, নবি বলেছেন, "এক মুদ্দ পরিমাণ পানি ওজুর জন্য যথেষ্ট এবং এক 'সা' পরিমাণ পানি গোসলের জন্য যথেষ্ট।

এমন কিছু লোক আসবে, যারা এই পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করবে না, এরা আমার সুন্নাহ'র অনুসারীদের বিপরীত হবে। কিন্তু যারা আমার সুন্নাহকে ধারণ করবে, তারা জান্নাতের পবিত্র বাগানের মধ্যে থাকবে।"[সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা]

আবেদদের কতক এমনও আছেন যারা নিয়্যাতের ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত হন। ফলে তারা ওজুকালীন সময়ে একবার বলেন, আমি নাপাকি দূর করছি, অতপর বলেন আমি নামাজের উপযুক্ত হচ্ছি, পুনরায় বলেন আমি নাপাকি দূর করছি। এসবের একমাত্র কারণ, শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, নিয়্যাতের স্থান হৃদয় জবান নয়। সুতরাং

জবানে উচ্চারণ একটি অনাবশ্যক বিষয়। আর নিয়্যাত যদি কেউ জবানে উচ্চারণ করে তবে একবার উচ্চারণই যথেষ্ট, বারবার উচ্চারণ নিরর্থক-অনাবশ্যক।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা অজুর পানি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তারা হতাশ হয়ে বলেন, এ পানি পবিত্র হওয়ার কি নিশ্চয়তা আছে! হতে পারে এতে নাপাকির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এরকম বহু অবাস্তব সম্ভাবনা তাদের মনে ঘুরপাক খায়। তাদের জেনে রাখা উচিত, যে পানি নাপাকির আলামত হতে মুক্ত তা পবিত্র হিসাবেই গণ্য হবে, আর এটাই শরীয়তের মূলনীতি। সুতরাং সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ মূলনীতি বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাদের কতক এমনও আছেন, যারা ওজুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করেন। আর শয়তান তাদের নিকট এ বিষয়টি উত্তম করে তোলে। তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রয়োজনাধিক পানি ব্যবহার চারটি মাকরুহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(১) পানির অপচয়

(২) এমন বিষয়ে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয়, যা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব নয়।

(৩) শরীয়ত অল্প পানি ব্যবহারে তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বেশী পানি ব্যবহার করে শরীয়তের প্রতি অতুষ্টি প্রকাশ করা। (৪)অঙ্গসমূহ তিনের অধিক ধৌতকরন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করে গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া।

আজানের ক্ষেত্রে

ইবলিশ ইসলামের প্রতিটি কাজে সংযোজন,পরিবর্তন করার জন্য কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে। শয়তান আবেদদেরকে আযানে সুর সংযোজনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ ইমাম মালিকসহ বহু ওলামায়ে কেরাম তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কেননা সুর সংযোজিত আযান গানের সাদৃশ্যতা লাভ করে, ফলে আযানের মর্যাদা ও গাম্ভীর্যতা ক্ষুণ্ণ হয়।

তাদের কতক এমনও আছেন, যারা আযানের আগে পরে যিকির, তাসবীহ-তাহলীল এবং ওয়াজ নসীহত করে থাকেন, ফলে আযানের সাথে এসবের সংমিশ্রণ ঘটে, অথচ অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম আযানের সাথে কোন কিছু সম্পৃক্ত করাকে মাকরুহ বলেছেন।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা অধিকাংশ সময় রাতের গভীরে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে কিংবা মসজিদের মাইকযোগে ওয়াজ নসীহত যিকির আযকার কিংবা উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম উড়ে যায়, নামাজরত ব্যক্তির খুশুখুযু নষ্ট হয় এবং তেলাওয়াতকারী বিভ্রান্তি র শিকার হয়। হায় তারা যদি জানতো, যা তারা করছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়ই নিকৃষ্ট।

সালাতের ক্ষেত্রে

সালাতের মধ্যে প্রথম শয়তান ধোকা দেয় নিয়্যাত নিয়ে।সে সবসময় সালাতকে নষ্ট করতে চায়।

শয়তানের কুমন্ত্রণার একটি দিক, যা সালাতকে নষ্ট করে, তা হচ্ছে, একই শব্দকে বারবার উচ্চারণ করা। যেমন: যখন তাকবীর উচ্চারণ করে, তখন আক..কা-কা- কাব্বার করতে থাকা, এবং তাহিয়্যাত বলার সময় 'আত... আত... তাহিইয়া' বলা। এই দৃশ্যমান ব্যাপারটি সালাত নষ্টের একটি নিয়ামক হতে পারে এবং যদি সে ইমাম হয়, তা হলে সে সকলের সালাত নষ্টের কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত সালাতই তাকে আল্লাহ থেকে বেশি দূরে ঠেলে দেবে, যতটা না সে কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেত! অন্যান্য বিষয়, যা সালাতকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে না, তা হচ্ছে মাকরুহ। কারণ, তা নবি-এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি।

যে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা হয় তা পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও বার বার ধৌত করে। এমন কি কোন মুসলমান উক্ত কাপড় স্পর্শ করলেও ধৌত করে।

আবার এমন লোকও ছিল-যারা নদীতে কাপড় ধুইত বাড়ীতে ধোয়া পছন্দ করত না। আবার কেউ কেউ কাপড় বেধে কুয়ার মধ্যে ভিজায়ে রাখত। যেমন ইহুদীরা করে থাকে। অথচ সাহাবাদের মধ্যে কেউই এমন করিতেন না। বরং পারস্য বিজয় করার পর তারা রেশমী ব্যতীত যে সমস্ত কাপড় পেয়েছিলেন তা দ্বারা নামায পড়তেন, চাদর স্বরূপ বিছানায় বিছাতেন।

নামাযের নিয়তে শয়তান ধোকা দিয়ে থাকে। যেমন কেউ বলে আমি অমুক নামাযের নিয়ত করতেছি। পুনরায় বলে। বার বার এমনিভাবে নিয়ত করে। এই ধারণা করে যে, আমি নিয়ত ছেড়ে দিয়েছি। অথচ শব্দের তারতম্য হলেও নিয়ত ভেঙ্গে যায় না।

আবার কেউ বার বার তাকবীর তাহরীমা বলিতে থাকে। এইরূপ করতে করতেই ইমাম রুকুতে চলে যায়। নাচার হয়ে তাকবীর বলে রুকুতে যায়। আমরা বুঝতে পারি না তখন কিভাবে ঠিক হয়ে যায় এবং পূর্বে কেন হয় নাই?

আমার তো এটাই মনে হয় তাকে তাকবীরে উলার এবং কেরাত শুনার পুণ্য হতে বঞ্চিত রাখার জন্য শয়তান এমনভাবে ধোকা দিয়েছে।

হযরত ইবনে আকীলের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল-আমি অযু করি। তারপর বলি অযু করি নাই। আমি তাকবীর বলি। তারপর বলি-তাকবীর বলি নাই।

ইবনে আকীল বললেন-তোমার প্রতি নামায ওয়াজিব নয়। তুমি নামায পড়িও না।

লোকে জিজ্ঞাসা করল-হযরত! আপনি কেমন ফতওয়া দিলেন? তিনি বললেন-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

رفع القلم عن الجنون

পাগল হতে কলম উঠায়ে নেওয়া হয়েছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি নামায আদায় করা ওয়াজিব নহে। কারণ, তার কথায় প্রমাণিত হয় সে পাগল। পাগলের উপর নামায ওয়াজিব নহে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, মানুষ আকলের ভারসাম্যহীনতা এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নামাজের নিয়্যাতের ব্যাপারে ওসওয়াসাগ্রস্ত হয়। একটি উপমা দ্বারা বিষয়টি সহজেই বুঝে আসে। যদি কারো বাড়িতে কোন বড় আলেমের আগমন ঘটে তাহলে সে ব্যক্তি আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়, আর দাঁড়ানোর পূর্বে সে মনে মনে বলে, ইনি একজন বড় আলেম, সুতরাং তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো উচিত। আর আলেমকে দেখামাত্র তার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিষয়টি মনে উদয় হওয়ার নামই নিয়্যাত। তদ্রুপ ফরয পালনার্থে নামাজের জন্য দন্ডায়মান হওয়া এমন একটি বিষয়, যার কল্পনা সে এক মুহূর্তেই করতে পারে, তাতে সময় দীর্ঘ হয়না; বরং সময়তো দীর্ঘ হয় কল্পনার বিষয়টি উচ্চারণের ক্ষেত্রে, আর নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ কোন আবশ্যক বিষয় নয়, বরং তা হচ্ছে একটি ওসওয়াসা, মূর্খতাই যার উৎপত্তিস্থল। আর ওসওয়াসাগ্রস্ত লোক মনের বিষয় মুখে উচ্চারণের দ্বারা নিজেকে অনর্থক কষ্টের সম্মুখীন করে। অথচ আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর সময় এই ব্যক্তিও লজ্জার দরুন এমনটি করতে অক্ষম হবে। এই উদাহরণ যার বুঝে এসেছে আশা করি নিয়্যাতের বিষয় তার নিকট পরিষ্কার হয়েছে।

আর নিয়্যাত তাকবীরের পূর্বে করাও জায়েজ। সুতরাং নিয়্যাতকে তাকবীরের সাথে মিলিয়ে নিজেকে কষ্টের সম্মুখীন করার কী প্রয়োজন। যেহেতু কষ্ট ছাড়াই তা অর্জিত হয়।

ওসওয়াসাগ্রস্তদের কতক এমনও আছেন, যারা বিশুদ্ধভাবে নিয়্যাতের পর তাকবীর বলেন, কিন্তু নামাজের বাকি বিষয়ে উদাসিনতা প্রদর্শন করেন। অথচ তাকবীর হচ্ছে দরজার ন্যায়,

যা দ্বারা নামাজ নামক গৃহে প্রবেশ করা হয়। সুতরাং দরজার প্রতি যত্নবান হয়ে ঘরের যত্ন ছেড়ে দেয়া কী বুদ্ধিমানের কাজ?

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা শয়তানের নেক ধোঁকায় বহু সুন্নাত ছেড়ে দেন। তাদের কারো অবস্থাতো এমন, যারা নামাজে
প্রথম কাতারে দাঁড়ান না। তারা বলেন, পিছনের কাতারে দাঁড়ানো একাগ্রতার জন্য বেশী সহায়ক, তাই প্রথম কাতারে না দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানোই আমার জন্য উত্তম। তাদের কতক এমনও আছেন, যারা নামাজে হাত বাঁধেন না। তারা বলেন, নামাজের প্রতি এমন একাগ্রতার বহিঃপ্রকাশ আমার নিকট অপছন্দনীয় যা আমার অন্তরে
নেই। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, কতক প্রসিদ্ধ বুজুর্গ থেকেও এরুপ আমল প্রকাশ পেয়েছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইলমের স্বল্পতাই তাদেরকে এরুপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) তাদের বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস নকল করেন, যা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মানুষ আজান ও প্রথম কাতারের ফযিলত জানতো, তাহলে লটারির মাধ্যমে হলেও তা লাভের প্রাণান্তর চেষ্টা চালাতো।

মুসলিম শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন
প্রথম কাতার পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠতর আর শেষ কাতার তাদের জন্য নিকৃষ্টতর।

আর নামাজে হাত বাঁধা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

من جهر হযরত বারিদা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন
بالقرائة في النهار فارجموه بالبحر

যে দিবসে উঁচু আওয়াজে (নামাজে) কোরআন তেলাওয়াত করে তাকে গোবর নিক্ষেপ করো।

একদল আবেদের অবস্থাতো এমন, শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার ফল স্বরুপ তারা রাতে বেশী পরিমাণে নফল পড়ে, আর তাদের কেউ সারারাত নফল এবাদতের পর ফজরের আগ মুহুর্তে ঘুমিয়ে পরে, ফলে হয় তার ফজর কাজা হয়ে যায় কিংবা জাগ্রত হয়ে নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই জামাত ফওত হয়ে যায় অথবা জামাতের সাথে নামাজ পড়ে সত্য; তবে রাত জাগরণের দরুন শারীরিক দুর্বলতার কারণে পরিবারের জন্য উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

কতক আবেদের অবস্থাতো এমন, যারা রাত দিন নফল পড়েন, কিন্তু অন্তর সংশোধন কিংবা খাদ্যের হালাল হারামের পরওয়া করেন না, অথচ নফলের আধিক্য হতে এসবের প্রতি গুরুত্ব দেয়াই তাদের জন্য উত্তম।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে

নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল কোরআন তেলাওয়াত করা। কিন্তু শয়তান কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তার একটি হল তেলাওয়াতের সময় ঘুম আসা, হাই ওঠা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে শয়তানের কুমন্ত্রণার কারনে রিয়ার সৃষ্টি হয়।
একদল আবেদের অবস্থাতো এমন, যারা অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করেন, কিন্তু তারতীল তাজভীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এতো এমন পদ্ধতি, শরীয়তে যার প্রশংসা অবিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী ওলামাদের একদলতো দিনে এক খতম কিংবা প্রতি রাকআতে এক খতম কোরআন পড়তেন। উত্তর হলো, তাদের থেকে এরুপ আমল কদাচিৎ প্রকাশ পেত। আর সর্বদা এভাবে তেলাওয়াত যদিও জায়েজ, কিন্তু তারতীল ও তাজভীদ রক্ষা করে কোরআন তেলাওয়াত ওলামাদের নিকট মুস্তাহাব।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام
অর্থঃ যে তিনদিনের কমে কোরআন খতম করে, কোরআন বুঝা তার পক্ষে সম্ভব হয়না।
কিন্তু শয়তান মানুষকে বুঝায় যে য়ত বেশি তাড়াতাড়ি খতম দিতে পারবে তার তত সওয়াব হবে।তাড়াতাড়ি পড়তে গিয়ে দেখা যায় সওয়াবের বিপরীত গুনাহ হয়ে যায়।

একদল কারীর অবস্থাতো এমন, যারা গভীর রাতে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করে, আর শয়তানও এ বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ ধরনের তেলাওয়াত দু' ধরনের গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।
১- মানুষের ঘুমে বিঘ্ন ঘটিয়ে কষ্ট দেয়ার গুনাহ
২- তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য লোক দেখানো হওয়ায় রিয়াকারের গুনাহ। তাদের কেউতো এমন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আযানের সময় মসজিদে তেলাওয়াত করেন, কেননা তা হচ্ছে লোক সমাগমের সময়।

লোক দেখানো কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এসব কারীদের যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে তা হলো, এক কারী ইমাম জুমআর দিন ফজর নামাজের পর মুসল্লিদের অভিমুখী হয়ে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে কোরআন খতমের দোয়া করতেন। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন মনে করে যে, তিনি কোরআন খতম করেছেন। এমন কারীদের জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের পূর্বসূরিদের রীতিনীতি এরুপ ছিলো না, বরং তারাতো এবাদত করতেন অতি গোপনে। কেউ তাদের এবাদত দেখুক কিংবা এবাদত সম্পর্কে অবগত হউক, এটা তারা মোটেও পছন্দ করতেন না।

রাবী বিন খুছাইম তো সব আমলই গোপনে করতেন। যদি দেখে কোরআন পড়াবস্থায় কেউ তার ঘরে প্রবেশ করতো তাহলে কাপড় দিয়ে কোরআন ঢেকে ফেলতেন; যেন তার কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি আগন্তুক বুঝতে না পারে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলতো অধিক পরিমাণে কোরআন পড়তেন, অথচ কখন তিনি কোরআন খতম করেন তা কেউ জানতেন না।

রোজার ক্ষেত্রে

প্রাচীন বুযুর্গদের একটি দল এমন অবস্থায় সদা সর্বদা রোযা রাখতেন যে, তাদের আহার ছিল মোটামুটি ধরনের। তাও আবার সবসময় জুটতো না। ফলে তাদের কারও দৃষ্টিশক্তি ছিল না কারও মস্তিষ্ক শুকায়ে গিয়েছিল। এটা নফসের প্রতি অন্যায় যে সেটার হক আদায় করা হয় নাই। সেটা এমনই কঠোর ছিল যে, নফস সেটা বরদাশত করতে পারে নাই।

কোন কোন আবেদ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি সারা বৎসরই রোযা রাখেন। তিনি এই কথা অবগত হওয়া সত্ত্বেও রোযা পরিত্যাগ করেন না। রোযা না থাকলে লোকের সম্মুখে এই ভয়ে পানাহার করে না যে, হয়ত তার প্রসিদ্ধি কমে যাবে।

এটা অতি সূক্ষ্ম রিয়া। যদি তার ইবাদতে এখলাস থাকত বা গোপন রাখার ইচ্ছা থাকত তবে সে এমন সব লোকের সম্মুখে পানাহার করত যারা তার নামের সুখ্যাতি করেছে। তারপর আবার অতি সংগোপনে রোযা রাখা আরম্ভ করত।

আবার কেহ কেহ লোকের নিকট বলে-আজ বিশ বৎসর যাবত আমি একাদিক্রমে রোযা রাখে আসতেছি। ইবলীস তাকে এই বলে ধোকা দেয় যে-তুমি তো এইজন্য এটা লোকের নিকট প্রকাশ করতেছ যে, লোক তোমার অনুকরণে রোযা রাখবে। অথচ আল্লাহ তাআলা সকলের নিয়ত সম্বন্ধেই পরিজ্ঞাত।

সুফইয়ান সাওরী বলেন-কোন ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত অতি গোপনে ইবাদত বন্দেগী করে। তারপর শয়তানের বার বার প্ররোচনায় লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়। তখন গোপনীয় দপ্তর হতে তার নাম কেটে দিয়ে প্রকাশ্য দপ্তরে লিখিত হয়। ফলে তাহার পুণ্য কমে যায়।

কোন কোন দরবেশের নিয়ম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। ঐদিন যদি তাকে কেউ পানাহারের আহবান জানায় তবে সে বলে-'ভাই! আজ তো সোমবার! অথবা আজ তো বৃহস্পতিবার। তখন তারা বুঝিতে পারে সে হয়ত আজ রোযা রেখেছে। আবার কেউ কেউ অন্য লোককে বক্র দৃষ্টিতে দেখে বলেন যে, তিনি রোযা আর তারা রোযাদার নয়। তাদের মধ্যে এমন অনেক দরবেশও আছেন যে রোযা রাখেন, কিন্তু যা পাওয়া যায় হালাল হারামের তারতম্য না করে ইফতার করেন। সারাদিন পরনিন্দা করে বেড়ান। পরস্ত্রীর দিকে তাকানো অন্যায় মনে করেন না। শয়তান তাদেরকে এই বলে ধোকা দেয় যে-রোযা এমনই সৎ কাজ যে সমস্ত পাপ সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

কিছু লোকের অবস্থাতো এমন, শয়তান যাদেরকে সর্বদা রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা জায়েজ, যদি সে রোযা রাখতে নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকে। তবে আপত্তি আসে দুই কারণে।

প্রথমতঃ সর্বদা রোযা রাখার দরুন শরীর দুর্বল হওয়ায় পরিবারের রুজি উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং স্ত্রী মিলনে অক্ষম হওয়ার দরুন স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ নফলের দরুন কত ফরয যে নষ্ট হয় তা গণনা করা দুষ্কর।

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা রোযা রাখার দরুন সে রোযার সর্বোত্তম ফযীলত হাতছাড়া করে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন
অর্থঃ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় রোযা দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা, তিনি একদিন রোযা রাখতেন একদিন পানাহার করতেন, আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নামাজ দাউদ আলাইহিস সালামের নামাজ, তিনি অর্ধরাত ঘুমিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাজ পড়ে শেষ ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন।

হজ্জের ক্ষেত্রে

প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, একবার হজ্জ পালনের দ্বারাই মানুষের উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়। হজ্জের ক্ষেত্রে কতক মানুষ লোক দেখানোর জন্য হাজী নাম পাওয়ার জন্য হজ্জ করে থাকে।

বহু লোক এমন আছেন, যারা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বারবার মক্কা অভিমুখে সফর করেন। এটা যে পূণ্যের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন এক মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু আপত্তি তখনি আসে, যদি এ হজ্জ পালন পিতা মাতার অসন্তুষ্টির কারণ হয়, অথবা হজ্জ পালনকারী জুলুম করে মাজলুম থেকে জুলুমের ক্ষমা না নিয়ে থাকে, অথবা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্য যদি হয় আনন্দ- বিনোদনে মন উৎফুল্ল করা, অথবা এমন মাল দ্বারা হজ্জ করা যা সন্দেহযুক্ত, কিংবা এ উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করা, যেন মানুষ তাকে হাজী সাহেব বলে।

এদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, যারা হজ্জের সফরে পবিত্রতা ও নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নষ্ট করেন, আর কাবার চারপাশে সমবেত হন এমন অন্তর নিয়ে যা কলুষিত, এমন হৃদয় নিয়ে যা অপবিত্র। অথচ হজ্জের উদ্দেশ্যই হলো অন্তরের নৈকট্য দেহের নৈকট্য নয়, আর অন্তরের নৈকট্যতো তাক্বওয়ার দ্বারাই অর্জিত হয়। সুতরাং হজ্জ পালনে যে তাক্বওয়ার পথ এড়িয়ে চলে, এমন হজ্জ এ ব্যক্তির কী উপকারে আসবে।

একদল লোক এমনও আছেন, হজ্জের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা বহুবার হজ্জ করে বলেন, আমি বিশবার হজ্জ করেছি। আবার কিছুলোক এমনও আছেন, যারা দীর্ঘকাল কাবার পাশাপাশি অবস্থান করা সত্ত্বেও অন্তর পবিত্র করার প্রতি মনোযোগ দেন না; বরং দম্ভকরে বলেন, আজ বিশ বছর যাবত কাবার পাশে অবস্থান করছি।

হজ্জ পালনকারীদের একদল এমনও আছে, যারা নামাজ নষ্ট করে এবং ওজনে কম দেয়, আর শয়তান তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এসবের ক্ষতিপূরক হিসাবে হজ্জই তোমার জন্য যথেষ্ট।

হজ্জ পালনকারীদের একদল এমনও আছেন, যারা হজ্জের পালনীয় কাজসমূহে এমন রীতি-নীতি আবিস্কার করেন যার অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, হজ্জ পালনকারীদের এক জামাআতকে আমি দেখেছি, যারা এক কাঁধ হতে ইহরামের কাপড় খুলে দেন এবং দীর্ঘকাল সূর্যের নিচে অবস্থান করেন, ফলে তাদের ত্বক নষ্ট হয়ে যায় আর মাথার চামড়া ফেটে যায় এবং এর মাধ্যমেই তারা মানুষের মাঝে নতুন বেশ ধারণ করেন। বুখারী শরীফের হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে মুখে লাগাম বেঁধে কাবাঘর তাওয়াফ করছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লাগাম কেটে দেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নাকে লাগামের আংটা লাগিয়ে তাওয়াফ করাচ্ছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কেটে দেন এবং লোকটিকে হাত ধরে তাওয়াফ করানোর নির্দেশ দেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ হাদীস ধর্মের বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভাবনের নিষেধাজ্ঞাকে শামিল করে যার নযির শরীয়তে নেই, যদিও উদ্ভাবনকারী নেক নিয়্যাতেই তা আবিস্কার করুক।

আবেদদের একদল এমনও আছেন, যারা তাওয়াক্কুলের দাবিদার, তাই তারা পাথেও ছাড়া হজ্জের সফরে বেড়িয়ে যান। তাদের ধারণা এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অথচ এরুপ তাওয়াক্কুলের নযির শরীয়তে নেই, বরং শরীয়ত তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বললো, আমি পাথেয় ছাড়া আল্লাহর উপর ভরসা রেখে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যেতে চাই। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তাহলে কোন কাফেলার সাথে শরীক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর করো। তখন লোকটি বললো, কাফেলার সাথে শরীক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তাহলেতো মানুষের ঝুলির উপর তুমি তাওয়াক্কুল করেছো।

জিহাদের ক্ষেত্রে

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মানুষ জিহাদে বের হয় কিন্তু তাদের নিয়্যাত থাকে বিভিন্ন রকম। কারো উদ্দেশ্য হয় গৌরব-প্রতিযোগিতা ও আত্মপ্রদর্শন, যেন মানুষ তাকে গাজী কিংবা সাহসী উপাধিতে ভূষিত করে। অথবা গনীমত লাভের আশা তাদেরকে জীহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অথচ নিয়্যাত অনুপাতেই আমলের প্রতিদান নির্ণীত হয়।

জিহাদের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হতে পারে। যদি তার নিয়্যাত হয় শুধু আল্লাহর জন্য।
নিয়্যাতেই বরকত। আমলের প্রথম শর্ত হল নিয়্যাত। একজন মানুষ নিয়্যাতের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারে আবার একই কাজ নিয়্যাতের ভিন্নতার কারনে জাহান্নামে ও যেতে পারে। জিহাদের ক্ষেত্রে নিয়্যাত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লোক দেখানোর জন্য জিহাদ করলে এর থেকে নিকৃষ্ট আর কি হতে পারে।

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদদের কতক এমনও আছেন, যারা সম্পদের আধিক্য দেখে ধৈর্যহারা হয়ে ধারণা করেন, আমার জিহাদ মাল আত্মসাতের ক্ষতিপূরক হবে। এসব ক্ষেত্রেই ইমান ও ইলমের নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। আবু ওবায়দা আনবরী বলেন, মুসলমানরা যখন মাদায়েন অবতরণ করে গনীমতলব্ধ মাল জমা করতে লাগলো তখন এক ব্যক্তি এসে তার কাছে বিদ্যমান গনীমতের মাল জমাকারীর নিকট জমা দিলে জমাকারীর সাথী বললো, এমন উদার দীল মানুষতো আমরা দেখিনি। সে যা জমা দিয়েছে তার মূল্যতো আমাদের গনীমতলব্ধ সব সম্পত্তি ছাড়িয়ে যাবে। সে তখন বললো, তুকি কী এখান থেকে নিজের জন্য কিছু রেখেছো? লোকটি বললো, আল্লাহর কসম; যদি আল্লাহর ভয় আমার দীলে না থাকতো তাহলে তোমাদের নিকট আমি তা কিছুতেই জমা দিতাম না। তারা তখন বুঝলো যে, লোকটি বড় মাপের কোন ব্যক্তি হবেন। তারা পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলো, কে আপনি? কি আপনার পরিচয়? সে বললো, আল্লাহর কসম; তোমাদের স্তুতি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমার পরিচয়ও দিবোনা এবং তোমাদের উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার আশায় তোমাদেরকে প্ররোচিতও করবোনা। বরং আমি আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তার প্রতিদানেই আমি সন্তুষ্ট। তখন পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে তারা এক ব্যক্তিকে তার পিছু পাঠায়। লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলে সে তার সাথীদেরকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, ইনি আমের বিন আবদে কায়স (রহ.)।

ধন সম্পদের ক্ষেত্রে

দুনিয়া বিমুখতায় প্রথম যুগের সুফিদের নিয়্যাত সৎ হওয়ায় ইবলিস তাদের সামনে মালের দোষ তুলে ধরতো এবং তার অনিষ্টের ভয় দেখাতো। ফলে তারা মাল বর্জন করে দরিদ্র জীবন অতিবাহন করতো। তাদের উদ্দেশ্য যদিও সৎ ছিলো কিন্তু জ্ঞান স্বল্পতার দরুন তারা ভুল কাজে লিপ্ত হতো।

এতো প্রথম যুগের সুফিদের অবস্থা, পক্ষান্তরে যারা এ যামানার সুফি তাদেরকে ধোঁকা সরবরাহে শয়তান অব্যাহতি নিয়েছে। কেননা পূর্ব যামানার ধোঁকাগ্রস্ত সুফিদের অনুসরণে তারা নিজেদের মালিকানাধিন সমুদায় সম্পত্তি সদকা করে পরিবার-পরিজন ও নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

আবু নছর তুসী বলেন, আমি রায় নগরীর কতক মাশায়েখকে বলতে শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ মাকরী ওয়ারিছ সূত্রে তার পিতা থেকে স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার দীনার লাভ করেন। অতঃপর যাবতীয় সম্পদ গরীবদের উপর খরচ করে তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে যান। এ জাতীয় বহু ঘটনা কিতাবের পাতায় বর্ণিত হয়েছে।

যারা এমনটি করেন আমরা মুতলাক্বভাবে তাদের নিন্দা করবোনা। যদি তারা পরিবার-পরিজন ও নিজের খরছ বাবদ প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেন, অথবা তার যদি এমন পেশা থাকে যা তাকে মানুষের দ্বারস্থ হতে নিবৃত্ত করে, অথবা তার মাল যদি সন্দেহযুক্ত হয় এবং সে তা গরীব- দুঃখীদের উপর সদকা করে দেয় তাহলে তার এ কাজ শরীয়তের
দৃষ্টিতে প্রশংসিত নিন্দিত নয়।
যদি কোন লোকের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন পথ থাকে যাহার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে না অথবা সম্পত্তি হালাল হওয়ায় সন্দেহ থাকে তবে এমন দানকারীর বিষয়ে আমাদের কিছুই বলার নাই। কিন্তু হালাল সম্পদ দান করার পর যদি অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় বা তাহার পরিবার পরিজন গরীব হইয়া যায়-তখন এমন ব্যক্তি হয় অন্যের উপর নির্ভরশীল হইবে অথবা অন্যায় উপার্জনকারীর দ্বারস্থ হইবে। এমন কাজ অবশ্যই নিন্দনীয়।

অজ্ঞ দরবেশগণ এমন কিছু করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু আফসোস তো ঐ সমস্ত লোকের জন্য যে জ্ঞানীগুণী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিভাবে শরীয়তবিরোধী এইসব কাজে উৎসাহ দান করে থাকেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- হালালও প্রকাশ্য হারামও প্রকাশ্য।

মুহাসেবী বলেন-মুরীদের কর্তব্য তার নিজস্ব ধনসম্পদ হতেও দূরে থাকা।

আমরা এই সম্বন্ধে বলেছি যে-তার সম্পত্তিতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, কিংবা সে অল্পে পরিতুষ্ট থাকে অথবা নিজের উপার্জনের উপর আস্থা থাকে তবে ধনসম্পদ হতে দূরে থাকা দোষণীয় নয়।

হযরত ইবরাহীম এবং শোয়াইব (আঃ) সম্পদশালী ছিলেন এবং কৃষিকার্য করতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইব বলিতেন-যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় না করে সে ভাল নয়। টাকা পয়সা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়, মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাওয়া যায়। সাঈদ ইবনে মুসাইব চারশত দেরহাম রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুফইয়ান সাওরী দুইশত দেরহাম রেখে মারা যান। তিনি বলতেন-এই যুগে টাকা পয়সা হাতিয়ার স্বরূপ।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বিপদাপদে কাজে লাগার এবং অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য করার জন্য তাদের সাধ্যানুযায়ী টাকা পয়সা সঞ্চয় করতেন। হাঁ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদিও ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্র থাকার মানসে ধনসম্পদের প্রতি উদাসীন ছিলেন- তবে
মুহাসেবী যদি বলতেন যে-কিছু টাকা পয়সা থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সঞ্চয়কে পাপ নামেই অভিহিত করতেন।

অভাব একপ্রকার রোগ। যে অভাবে পড়ে ধৈর্যধারণ করে সে অত্যন্ত পুণ্যবান। তাই অভাবগ্রস্ত লোক সম্পদশালীর চেয়ে পাঁচশত পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কারণ সে দুঃখের সময় ধৈর্যশীল ছিল।

সম্পদ একপ্রকার নেয়ামত। নেয়ামতের জন্য অবশ্য শুকরিয়া আদায় করতে হয়। সম্পদশালী যখন পরিশ্রম করে এবং নিজকে ভাল কাজে নিয়োজিত করে তখন সে মুজাহিদ এবং মুফতীর মর্যাদায় পৌঁছে। অভাবগ্রস্ত নির্জনতা অবলম্বনকারীর ন্যায়।

আবু আবদুর রহমান সালামী সুনানে সুফীয়া নামক এক কিতাব রচনা করেছেন তাতে লিখেছেন যে-ফকীরের পক্ষে ধনসম্পদ কিছু রেখে মারা যাওয়া মাকরূহ। প্রমাণস্বরূপ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে-আহলে সুফফার একজন সাহাবা দুইটি দীনার রেখে মারা গেলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন-
'ইহা জাহান্নামের দুইটি দাগ।'

গ্রন্থকার বলেন-প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত সে-ই এই হাদীস প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করতে পারে। যে সাহাবা মারা গিয়েছিলেন-তিনি দান খয়রাত গ্রহনের ব্যাপারে অন্যদের সাথে ঝগড়া করিতেন। তার নিকট যা ছিল তা রেখে মারা গিয়েছিলেন। তাই ইরশাদ করেছিলেন ইহা জাহান্নামের দুইটি দাগ।

যথার্থ ধনসম্পদ রেখে মারা যাওয়া যদি দোষণীয় হত তবে নবীজী ইরশাদ করতেন না-তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারী অভাবের তাড়নায় অন্যের দ্বারে হাত প্রসারিত করার চেয়ে কিছু রেখে যাওয়াই ভাল।

যদি দোষণীয়ই হত তবে সাহাবা কেরামগণও টাকা পয়সা রেখে মারা যেতেন না।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন-একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাহ দেওয়া সম্বন্ধে উৎসাহ দিলেন। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক পরিমাণ আনিয়া হাজির করলে ইরশাদ করলেন- হে ওমর। ছেলেমেয়েদের জন্য কি রেখে এসেছো? আমি বলিলাম-যতটা এনেছি ততটা পরিমাণই রেখে এসেছি । আমার কথার পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন প্রকার মন্তব্য করিলেন না।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন -আবু বকরের টাকা পয়সা দ্বারা আমি যতটা উপকৃত হয়েছি আর কারও সম্পদ দ্বারা ততটা উপকৃত হই নাই।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন-নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি খেদমতে উপস্থিত হলে ইরশাদ করলেন-পোশাক পরিধান করে এবং হাতিয়ার বেঁধে আসো। আমি সজ্জিত হয়ে আসার পর বললেন-তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠাচ্ছি।

আল্লাহ তোমাকে সহী সালামত রাখবেন এবং গনীমত দান করবেন। নেক নিয়তের সাথে যত খুশী টাকা পয়সা গ্রহণ করিও।

আমি বললাম-ইয়া রাসূলাল্লাহ! টাকা পয়সা লাভের আশায় আমি ইসলাম গ্রহণ করি নাই বরং ইসলামের মহব্বতে মুসলমান হয়েছি।

তিনি ইরশাদ করলেন-হে আমর! হালাল সম্পদ ভাল লোকের জন্য খুব উপকারী।

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন-হুযুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মঙ্গল কামনা করিয়া দোআ করিলেন। দোআর শেষাংশ ছিল-হে আল্লাহ ! আনাসকে অধিক সন্তানাদি এবং সম্পদ দান কর ও তাতে বরকত দাও।

পানাহারের ক্ষেত্রে

কম এবং শক্ত বস্তু খাওয়া এবং ঠাণ্ডা পানি পান না করার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের সূফীদিগকে এই সম্বন্ধে ধোকা দেওয়ার পরিশ্রম হতে শয়তান রেহাই পেয়েছে।

প্রাথমিক যুগের সূফীদের কেউ কেউ একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। অপারগ হলেই কিছু পানাহার করতেন। আবার কেউ কেউ প্রত্যহ যৎসামান্য কিছু আহার করতেন।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ সম্বন্ধে বলেন-তিনি প্রথমাবস্থায় এক দেরহামের মিঠাই খরিদ করে একত্র মিশ্রিত করতেন। অতঃপর সেটাকে তিনশত ষাট ভাগ করে প্রত্যেক দিন এক ভাগ করে খেতেন। আবু হামেদ তুসী ইবনে আবদুল্লাহ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, বহুদিন পর্যন্ত তিনি কূল পাতা খেয়েছেন। তার পর খেয়েছে ভুষী। তিন বৎসরে মাত্র তিন দেরহাম মূল্যের খাদ্য খেয়েছেন।

আবু তালেব বলেছেন-কোন কোন সূফী চেষ্টা করে আহারের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন। কম আহার করলে শরীরের রক্ত কম হয়ে সাদা হয়ে যায়। এই সাদা আল্লাহর নূর। ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্তরের চর্বি গলে অন্তরকে কোমল করে। অন্তরের কোমলতা কাশফের চাবিকাঠি।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেন-প্রাথমিক অবস্থায় সূফীদের কর্তব্য একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখার পর ইফতার করা। ছোট গ্রাসে তরকারী ব্যতীত আহার করা। ফলমূল, সুস্বাদু খানা, ভাই বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং কিতাব অধ্যয়ন পরিত্যাগ করা। কারণ এই সব নফসের আনন্দ দানকারী।

আবার কেউ কেউ চল্লিশ দিনের জন্য চেষ্টা করার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে তারা ভাত রুটি না খাইলেও ভাল ফল ও উহার রস খেয়ে থাকেন।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় সৃষ্ট মনের অসুখ

আল্লাহপাক আমাদের জাহেরি আমলসমূহের মধ্যে কিছু আমল ফরজ, কিছু আমল ওয়াজিব, কিছু মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে বাতেনি আমলসমূহের মধ্যেও কিছু আমল ফরজ, কিছু গুনাহ এবং কিছু হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এসব থেকে বেঁচে থাকা ততোটাই জরুরি, যতোটা জরুরি জাহেরি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
শয়তান সবসময় মানুষকে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে মনের অসুখ সৃষ্টি করতে চায়। যদি সে মনের অসুখ সৃষ্ট করতে পারে তাহলে তার আর তেমন কোনো কাজ করতে হয় না। মানুষ তখন একের পর এক গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে থাকে।

মানবজীবনের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক তিনটি বস্তু- হিংসা, অহংকার ও গীবত। অথচ এ তিনটি রোগই আমাদের মধ্যে খুব সহজে বিরাজমান। চলতে ফিরতে বলতে জানা অজানায় বিভিন্নভাবে এই ব্যধিতে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

হিংসা

হিংসার পরিচয় হলো, কেউ একজন কাউকে দেখলো, সে কোনো নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে বা সফলতা অর্জন করেছে। সেটা দুনিয়াবিও হতে পারে পরকালীনও হতে পারে। তার প্রাপ্তি ও সফলতা দেখে অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি হয়। ভাবতে থাকে, সে কেন এটা পাবে! সেই সঙ্গে মনের ভেতরে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যদি তার থেকে এসব নেয়ামত ও সফলতা চলে যেতে। তাহলে ভালো হতো।

এটাই হিংসার মূল পরিচয়।

এর একটা উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো বান্দাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথবা কাউকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেছেন, কিংবা কাউকে দান করেছেন জনপ্রিয়তা, অথবা কাউকে দিয়েছেন সম্মান, অথবা কাউকে দান করেছেন জ্ঞান-গরীমা।

এসব দেখে অন্য কোনো ব্যক্তির অন্তরে যদি এমন ইচ্ছা জাগে, এই নেয়ামত বা সফলতা সে কেন পেল? তার থেকে যদি এসব নেয়ামত চলে যায়, তবে ভালো হয়। এমনকি নেয়ামতপ্রাপ্ত

ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিষয় শুনলে সে খুশি হয়। এবং তার কোনো উন্নতি-অগ্রগতি দেখলে মনে কষ্ট লাগে, আফসোস হয়। ভাবে, তার কেন এতো উন্নতি হবে...!

এরই নাম হিংসা।

হিংসার তিনটি স্তর

১. অন্তরে এমন ইচ্ছা জাগা, অমুকের মতো আমারও ওই সম্পদ হাসিল হোক। তার কাছে থাকা অবস্থায় যদি হাসিল হয়, তো ভালো কথা। অন্যথায় সে বঞ্চিত হয়ে তা আমার অর্জিত হোক।

২. অন্য কারো ভালো কিছু দেখে মনে এই খাহেশ সৃষ্টি হওয়া, তার থেকে ওগুলো চলে যাক এবং আমার হোক।

৩. অন্য কারো ভালো কিছু দেখে এই ভাবা, তার থেকে যেকোনোভাবে ওগুলো ছুটে গিয়ে আমার হোক। এবং ওই নেয়ামতের কারণে সে যে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অর্জন করেছে, তা থেকেও সে বঞ্চিত হোক। এরপর চাই সেই নেয়ামত আমার হোক বা না হোক। হিংসার এই তৃতীয় স্তরটি সবচেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট। এসব থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন।

হিংসার একটি অনিবার্য পরিণতি হলো, যার প্রতি হিংসা করা হয়, সে যদি কোনোরকম কষ্টে থাকে অথবা কোনো চিন্তা-পেরেশানিতে পড়ে তাহলে হিংসুক খুশি হয়। আর যদি তার কোনো উন্নতি দেখে, বা তার কোনো প্রাপ্তি ও সফলতা অর্জিত হয়, তবে হিংসুকের খুব কষ্ট হয়। আর অন্য কারো কষ্টে খুশি হওয়াকে আরবি ভাষায় 'শামাতাত' বলা হয়। এটাও হিংসার একটি প্রকার। কুরআন হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে নিন্দা প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه

অর্থ : কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যের প্রতি হিংসা করে যে, আল্লাহ পাক তার নেয়ামত অন্যদেরকে দান করেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৪)

এ কারণে এসব লোক হিংসা করে এবং জ্বলে-পুড়ে মরে।
মূলত হিংসার বিপরীত হল ঈর্ষা।

হিংসা অবশ্যই না জায়েয। কিন্তু আরেকটি বিষয় আছে, যা স্বভাবগতভাবে মানুষের ভেতরে থাকে।

অনেক সময় এমনটি হয়ে থাকে, কারো কোনো সফলতা প্রাপ্তি দেখে মনে মনে ইচ্ছা জাগে, আমিও যদি এটা অর্জন করতে পারতাম, ভালো হতো। এটাকে হিংসা বলে না। এটাকে আরবিতে বলা হয় গিবতা। এর অর্থ ঈর্ষা। কখনো বা আরবি ভাষায় এ বিষয়টাকে হাসাদ বা হিংসা শব্দেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হিংসা নয়। এটাকে ঈর্ষা বলে। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে, কোনো ব্যক্তির সুন্দর মনোরম বাড়ি-ঘর দেখে মনে যদি এই আগ্রহ হয়, তার মতো যদি আমারও সুন্দর ও আরামদায়ক একটা বাড়ি হতো, কতোই না ভালো হতো। অথবা অমুকের যে ধন- সম্পদ, প্রতিপত্তি, জ্ঞান-গরীমা রয়েছে, আল্লাহপাক যদি এমনটি আমাকেও দান করতেন...। এভাবে চিন্তা করাকে হিংসা বলা হবে না।

কিন্তু যদি কারো সফলতা ইত্যাদি দেখে মনে জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং তার সফলতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া কামনা করে, তাহলে তা অবশ্যই হিংসা বলে গণ্য হবে।
শয়তান ঈর্ষার সময় হিংসার কুমন্ত্রণা দেয়। আর মানুষকে বুঝায় এটা হিংসা না এটা ঈর্ষা।

অহংকার

শয়তান মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করতে চায়।কারন এটা সম্পূর্ণ ইবলিশের চরিত্র। হাদিস শরীফে এসেছে, যার মধ্যে চুল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

মানবজীবনের আরেকটি জঘন্যতম, নিকৃষ্ট ও আমল ধ্বংসকারী বদ- স্বভাব অহংকার। আরবীতে বলা হয় তাকাব্বর। এর আভিধানিক অর্থ, নিজেকে বড় মনে করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ইলম-আমল, জ্ঞান- গরীমা, অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, উন্নতি-অগ্রগতি, বংশ-মর্যাদা, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সঙ্গে অন্যকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করাকে অহংকার বা তাকাব্বুর বলা হয়।

কারো মধ্যে বিন্দু পরিমাণে অহংকার থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আপনি আমি যতো বড় আলোম, জ্ঞানী, নেতা বা যে কেউ হই না কেন, এই অহংকার যদি কারো মধ্যে

থাকে (আল্লাহ না করুন) সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে বিষয়ে অহংকার করবে, তা এক সময়ে বিলীন হয়ে যাবে।

আমরা মুয়াল্লিমুল মালাইকা বা ফেরেশতাদের সরদার ইবলিশের ইতিহাস জানি। সকল ফেরেশতা জগতের সম্মানি ও সর্দার হওয়া সত্ত্বেও সে এখন চির অভিশপ্ত আল্ল হপাক তাকে চিরতরে জাহান্নামের অধিবাসী করেছেন।

অহংকার শয়তানের চরিত্র।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অহংকারী মনোভাব দেখিয়েছিল শয়তান। এর মাধ্যমে অহংকার দেখানোর পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে শয়তান। কাজেই যারা সামান্য সহায়-সম্পদ, পদ-পদবি ও রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে বড়াই করে তারা শয়তানের উত্তরসূরি। খোদাদ্রোহী লোকদের স্বভাব হলো, অন্যদের অপমান করা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। কুযুক্তি উপস্থাপন করে শয়তান নিজেকে বড় হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল, আগুনের তৈরি হয়ে আমি কেন মাটির তৌর আদমকে সিজদা করবো?

মহান আল্লাহ ইবলিসকে প্রশ্ন করেছেন, কেন সে আদম (আ.)-কে সিজদা করেনি। সে অত্যন্ত দম্ভভরে বলেছিল, আমি পঁচা কাদামাটি থেকে সৃষ্ট মানবকে সিজদা করবো না। কেননা আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। মাটির চেয়ে আগুন উত্তম। কেননা আগুনের স্বভাব হলো, সে বরাবরই ঊর্ধ্বমুখী। আগুন প্রখর ও তেজদীপ্ত। অন্যদিকে মাটি নিম্নমুখী ও নিস্তেজ। তাই আগুনের তৈরি হয়ে সে মাটির মানুষের সামনে সিজদাবনত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

শয়তানের এ যুক্তি ছিল অসার। কেননা ভালো উপাদান দিয়ে তৈরি হওয়া বস্তু উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়। যেমন, ফেরেশতারা নুরের তৈরি। নুর আগুন থেকে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও ফেরেশতারা মাটির তৈরি মানুষের সামনে সিজদাবনত হতে দ্বিধাবোধ করেননি। শয়তান যে আল্লাহপাকের অবাধ্য হয়েছে, এর মূলে ছিল অহমিকা।

অহংকার মানুষের ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। অহংকার থেকে বাঁচতে আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ, জ্ঞান-যোগ্যতাকে আল্লাহ প্রদত্ত দয়া, রহমত ও নেয়ামত ভেবে তার শোকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এসব নেয়ামত পাননি তার জন্য মহান রবের দরবারে দোয়া করতে হবে, যাতে আল্লাহ তাকেও এ সব নেয়ামত দান করেন। আর এ মানসিকতা পোষণ করতে হবে, আমি যে ইবাদত-বন্দেগি করছি তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। কাজেই আমার তৃপ্ত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ প্রদত্ত এ নেয়ামত যেকোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন, তিনি একজন বাদশাকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ফকিরে পরিণত করতে পারেন।

আমাদের সব নেয়ামত আল্লাহর দান। আর এ নিয়ে গর্ব করার অর্থ- দানকারীর দানের অবজ্ঞা করা। অতএব আমাদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যাতে কখনো সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা, শিক্ষা, সৌন্দর্য, পেশা বা অন্য কোনো নেয়ামতের কারণে অহংকার না করি, অন্যকে হেয়প্রতিপন্ন না করি।

অহংকারীরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত

سَاصْرِفُ عَنْ أُيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَيْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلِينَ

যারা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহংকার করবে, আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবো। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না। আর তারা ভ্রান্তপথ দেখলে তা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এজন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৪৬).

গীবত

গীবত বা পরনন্দিা সামাজিক শান্তি বধ্বিংসী একটি ঘৃণ্য অপরাধ। পবিত্র আল-কুরআনে গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর হাদীসে একে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ আজকাল অপরের দোষর্চচা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপররে দোষর্চচা না করলে মনে হয় আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের কী যেন প্রয়োজনীয় কাজটি বাদ পড়ে গেছে।

গীবত এতো গুনাহের কাজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা গীবত পরিত্যাগ করতে পারছি না, গীবত বর্জনের কোনো প্রচেষ্টাও করছি না। এর জন্য অবশ্য আমাদের অজ্ঞানতা, আমাদের অসচেনতা, অবহেলা ইত্যাদিই মূলত দায়ী।

গীবত আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ, অনের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। গীবতের পরিচয় প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন কছুি উল্লেখ করা যা শুনলে সে অপছন্দ

করবে তাই গীবত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, গীবত হচ্ছে , তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছো যা প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে বিদ্যমান আছে।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, গীবত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি এমনভাবে উল্লেখ করলে যে, তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে। ইবনুল আসীরের মতে, কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতি। দ তার দুর্নাম করা, যদিও তার মধ্যে সেই দোষ থেকে থাকে, তাই গীবত।

ইমাম নববী রহ. এর মতে, কোনো ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে তা প্রকাশে হোক বা ইশারা ইঙ্গিতে হোক, তাই গীবত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর মতে, গীবত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পকে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্টি বা চিন্তান্বিত হবে, তা সত্য হলেও। আর সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম 'অপবাদ।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানীর মতে, নিষ্প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা হচ্ছে গীবত।
একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা থেকে বিরত
থাকা উচিত। শয়তান যখনই অন্য মুসলিম ভাইয়ের ব্যাপারে খারাপ
ধারণা করতে কুমন্ত্রণা দেবে তখনই সে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া
করবে ফলে শয়তান ক্ষুদ্ধ হয়ে তাকে আর এ ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দিবে না।

শরীয়তের হুকুম মোতাবেক কিছু ক্ষেত্রে গীবত গুনাহর কাজ নয়। প্রথমত, যুলুম বা বে-ইনসাফির প্রতিবাদ। কোন মযলুম অথবা বেইনসাফির শিকার ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে কোনো জালিম কর্তৃক সংঘটিত যুলুম বা বেইনসাফির উল্লেখ করতে পারবে এমন কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে ঐ জালিমকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে। দ্বিতীয়ত, কোনো যুলুম বা বেইনসাফির পরিবর্তনে এবং জালিমকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অন্যদের সাহায্য কামনা করতে। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা। যদিও মুফতির কাছে ফতোয়া চাইতে গেলে ঐ জালিম ব্যক্তির ব্যাপারে আকারে-ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করাই ভালো।

চতুর্থত, কোনো অনিষ্টকর বিষয়ে মুসলিমদের সতর্ক-সাবধান করা। যেমন কেউ কোনো মুত্তাকি ব্যক্তিকে ওই দুষ্ট চরিত্রের লোক সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে যার কাছে সে নিয়মিত যাতায়াত করে কিন্তু তার চরিত্রের অন্ধকার আর অনৈতিক দিক সম্পর্কে সে জানে না।
কিন্তু আমাদের শয়তান নেক সুরতে ধোকা দানের জন্য প্রথমে যে গীবত করলে গুনাহ হয় না এতে প্রবেশ করায় তারপর গুনাহের গীবতের কুমন্ত্রণা দেয়।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ এবং তোমরা একে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না এবং পরষ্পর গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)

বিদআতের মাধ্যমে শয়তানের ধোকা

বিদআত পালনে শয়তান খুশি হয়।

সুন্নতের শেষফল হল হেদায়েত। তাই সুন্নত পালনে খুশি হন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর বিদআতের শেষফল গোমরাহী। তাই বিদআত পালনে খুশি হয় নফস ও শয়তান। অনুরূপভাবে বিপরীত দিক থেকেও কারো সুন্নত পালন দেখলে শয়তান নাখোশ হয় যেভাবে কারো বিদআত পালন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নাখোশ বানিয়ে দেয়। মুসলমান এখন নিজেরা ফয়সালা করবে যে, সে কাকে খোশ রেখে কাকে বেজার করবে। কেউ যদি জেনে বুঝেও বিদআত করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নাখোশ বানিয়ে শয়তানকে খুশি রাখতে চায়- সেটা তার বিষয়। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে, বিদআত ত্যাগ করা ছাড়া আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক কাজের একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব সুন্নতের ক্ষেত্রে যেমন পাওয়া যায় বিদআতের ক্ষেত্রেও তেমন। সুন্নত পালন দ্বারা মানুষের দিল তাজা হয়। দিলে রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমলের শওক ও জযবা বাড়ে। দুনিয়ার মোহ কমে যায়। কবর ও আখিরাতের প্রতি মায়া বাড়ে।

প্রত্যেক কাজের একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব সুন্নতের ক্ষেত্রে যেমন পাওয়া যায় বিদআতের ক্ষেত্রেও তেমন। সুন্নত পালন দ্বারা মানুষের দিল তাজা হয়। দিলে রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমলের শওক ও জযবা বাড়ে। দুনিয়ার মোহ কমে যায়। কবর ও আখিরাতের প্রতি মায়া বাড়ে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনের দ্বারা মানুষের নফস তাজা হয়। দিল থেকে রূহানী শক্তি লোপ পেতে থাকে। আমলের জযবা হ্রাস পায়। দুনিয়ার মোহ বাড়ে। কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ তো নয়ই খালিস ইবাদত নামায রোযাও জাগতিক মোহ পূরণের উপকরণে পরিণত হয়ে যায়। বিদআতের রূহানী ক্ষতিকারক এ দিকটির প্রতি নির্দেশ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী বলেন, যে কোনো বিদআতকারী প্রকৃত রূহানিয়্যত অর্জন করতে পারে না।

বিদআত শয়তানের অস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। যুগে যুগে শয়তান বনী আদমকে গোমরাহ করার চেষ্টা করে আসছে। শয়তানের বানানো গোমরাহীর রাজ্যকে ভেঙ্গে দিয়েছেন যুগে যুগে প্রেরিত পয়গাম্বরগণ। তাতেই শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর ভীষণ নাখোশ। পয়গাম্বরগণের মধ্যেও বেশি নাখোশ হল আখেরী পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। কারণ সায়্যিদুল মুরসালিন শয়তানের নির্মিত শিরক- কুফরকে শুধু দমনই নয়; আরব উপদ্বীপ থেকে সমূলে উৎখাত করেছেন। শিরক ও কুফরের কোমর এমনভাবে ভেঙ্গে দিয়েছেন, যা সোজা করা

শয়তানের পক্ষে সুকঠিন। তাছাড়া ঈমান ও আমলের চতুর্দিকে সুন্নতের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করে তাওহীদকে এমন কঠিনভাবে সংরক্ষিত করেছেন যা ইতোপূর্বে কোনো নবী করে যেতে পারেননি। এ সব কারণে শয়তান শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বেশি নাখোশ। তবে তার কাছে সান্ত;নার একটি জিনিস আছে। সেটি হল তার দীর্ঘকালীন হায়াত।

শয়তান এ সুযোগকে কাজে লাগায়। সব নবীর ইন্তেকালের পরই শয়তান বিভিন্ন কায়দায় এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নবীর শিক্ষাকে বিলীন করেছে। উম্মতকে তাওহীদ ও রিসালাতের পথ থেকে সরিয়ে বিদআত ও শিরকের পথে নিক্ষেপ করেছে।

শয়তান অভিজ্ঞ। পৃথিবীর যে কোনো মানুষের তুলনায় তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সে অবাধ্যতা করেছে হযরত আদম আ.-এর সাথে। তারপর সকল যুগের সকল পয়গাম্বরের সাথে, সহীহ ঈমান ও আমল বিশিষ্ট সকল মুসলমানের সাথে। মানুষেরা সকলে চলে গিয়েছে বা যাচ্ছে কিন্তু শয়তান রয়ে গেছে। সে আছে ও থাকবে। অভিজ্ঞতার বিশাল পাহাড় নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন অভিজ্ঞ শত্রুর হাত থেকে বাঁচা সাধারণ মুসলমানের জন্য কি খুব সহজ? সাধারণ বিচারে তার হাত থেকে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কেউ যদি শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে স্রষ্টা মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী নবীর পথে অটল অবিচল থাকে তবেই শয়তানের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। মুমিনদের সাথে মহান আল্লাহর খাস রহমত বিদ্যমান আছে। তাই এখনো অধিকাংশ মুমিন সুন্নতের উপর অটল রয়েছে। যদি এই রহমত না থাকত তাহলে বহু আগেই তারা বিদআতের আবর্তে দ্বীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য ছিল।

শয়তান অভিজ্ঞ ও চতুর বিধায় বিদআতকে পছন্দ করে। এমনকি স্পষ্ট নাফরমানীর চেয়েও বিদআত জঘন্য কাজ। কিন্তু লোকেরা একে সামান্য বিষয় মনে করে। এটাও শয়তানের কারসাজি। কাজটি সামান্য বলে দেখিয়ে তা সম্পাদনের রাস্তা তৈরি করে শয়তান। তারপর সে কাজের মাধ্যমে সে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করে নেয়।

আলেমদের উপর শয়তানের নেক চক্রান্ত

শয়তান মানুষের মধ্যে যাদের পিছনে বেশি সময় দেয় তারা হল হক্কানী আলেম সমাজ। শয়তান তাদের প্রতিটি কাজে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এক সম্প্রদায়ের অবস্থাতো এমন যারা উচ্চ মনোবলের কারণে কোরআন, হাদীস, ফিক্হ ও ভাষাসাহিত্যসহ শরীয়তের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া-আখেরাতে নিজেদের মর্যাদা সমুন্নত করেন। তখন শয়তান তাদের নিকট এসে ধোঁকার নেক দুয়ার তাদের সামনে উন্মোচন করে। সে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অন্যের নিকট তা পৌছানোর ফযীলত তাদের সামনে তুলে ধরে নিজেদেরকে নিজেদের নিস্ট বড় করে তোলে।

সুতরাং তাদের কাউকে সে প্ররোচিত করে ইলম অন্বেষণে দীর্ঘ শ্রম ব্যয় করার কারণে, তখন সে তার সামনে আরাম-আয়েশের বিষয়টি উত্তম করে তোলে। সে তাকে বলে, আর কতকাল এভাবে পরিশ্রম করবে? এখন সময় এসেছে, কষ্টভোগ থেকে নিজেকে একটু বিশ্রাম দাও, মন যা চায় তা ভোগকরার জন্য নিজেকে একটু অবকাশ দাও। যদি কখনো তোমার স্খলন ঘটে যায় তাহলে শাস্তি হতে ইলম তোমাকে রক্ষা করবে। অনন্তর সে তুলে ধরে তার সামনে আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত।

সুতরাং এ বান্দা যদি শয়তানের চক্রান্ত হতে রক্ষা পেতে ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের উন্মোচিত নেক দুয়ারে প্রবেশ করে তাহলে সে ধ্বংস হবে। আর যদি সে আল্লাহর তাওফীকে চক্রান্ত হতে রেহাই পায় তাহলে তার কর্তব্য হলো শয়তানকে এ কথা বলা, তোমার বক্তবে তিনপ্রকার ব্যাখ্যা আমার নিকট রয়েছে।

প্রথমতঃ আলেমের ফযীলত তো আমলের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং যদি ইলম অনুযায়ী আমল না থাকে তাহলে সে ইলম অর্থহীন। আমি যদি ইলম অনুযায়ী আমল না করি তাহলেতো আমি ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে যাবো যে ইলমের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম নয়। তদুপরি আমার দৃষ্টান্ত হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খাবার জমা করে ক্ষুধার্তদেরকে খাইয়েছে কিন্তু নিজে তা থেকে ভক্ষণ করে নি, ফলে সে খাবার ক্ষুধা নিবারণে তার কোন উপকারে আসেনি।

দ্বিতীয়তঃ বেআমল আলেমের নিন্দা প্রকাশার্থে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে তা স্বরণ করে শয়তানের বিরোধিতা করা।

তৃতীয়তঃ এলেম থাকা সত্ত্বেও আমল না করার কারণে যেসব আলেমরা ধ্বংস হয়েছে তাদের শাস্তির কথা স্বরণ করা, যেমনঃ- ইবলিস, বালআম ও অন্যান্যরা।

পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী এক শ্রেণীর আলেম এমনও আছেন, যাদের রাত কাটে কিতাব মুতালাআয়, আর দিন কাটে গ্রন্থ রচনায়। শয়তান তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এর দ্বারাতো দীনের বেশ প্রচার হচ্ছে। তবে ক্রমান্বয়ে শয়তান ধোঁকার কৌশল পরিবর্তন করে। ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় লোকসমাজে আলোচিত হওয়া, খ্যাতি- সুখ্যাতি উঁচু হওয়া, নেতৃত্বের আসনে সমীচিন হওয়া এবং লেখকের
নিকট দূরদূরান্ত হতে লোকজনের আগমন ঘটা।

এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বুঝার উপায় হলো, যদি মানুষ তার গ্রন্থ দ্বারা দ্বিধাহীনভাবে উপকৃত হয় কিংবা ইলমে তার সমকক্ষ কারো সামনে তা পড়ে শুনানো হয় এবং গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা না হয়। তবুও সে আনন্দিত হবে, যদি তার উদ্দেশ্য হয় ইলমের প্রচার- প্রসার।

আমাদের পূর্বসূরি কতক আহলে ইলম বলেন, ইলমের কোন অধ্যায় আমার জানা হলে আমি পছন্দ করি যে, মানুষ যেন তা আমার থেকে শিখে উপকৃত হয়, কিন্তু শিখার বিষয়টি আমার দিকে সম্পৃক্ত না করে।

এই শ্রেণীর আলেমদের কতক এমনও আছেন, যারা অনুসারীদের আধিক্য দ্বারা আনন্দিত হন। আর শয়তানও তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, এই আনন্দতো ইলম অন্বেষণকারীদের আধিক্যের কারণে, যা দোষণীয় নয়। অথচ তার অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় ছাত্রের আধিক্য দ্বারা চতুর্দিকে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়া।

এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বুঝার উপায় হলো, যদি আগত ছাত্রদের কেউ তার চে' অধিক ইলমের অধিকারী কোন আলেমের দরবারে চলে যায় তাহলে তার মন ব্যথিত হয়; অথচ এটা কোন মুখলিস ওস্তাদের বৈশিষ্ট হতে পারে না। কেননা মুখলিস ওস্তাদের উদাহরণতো ঐসব ডাক্তারের ন্যায় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রুগিদের। চিকিৎসা করেন। যদি কোন রুগি তাদের অনুরুপ কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করে তাহলে অন্য ডাক্তারও আনন্দিত হন।

আবেদদের উপর শয়তানের নেকচক্রান্ত

শয়তান আবেদদের কে সহজে ধোকা দিতে পারে কেননা আবেদের ইলম কম থাকে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের প্রধান ফটক হচ্ছে, ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। তাই ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে শয়তান নিরাপদেই প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির হৃদয়ে শয়তান অতি গোপনে প্রবেশ করে।

ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান সল্পতার কারণেই শয়তান বহু আবেদকে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়েছে। ফলে তাদের অধিকাংশরা এবাদত নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। তারা না ইলমের গভীরে প্রবেশ করেছে না প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেছে। এ কারণেই রাবী বিন হাইছাম বলেন,

تفقه ثم اعتزل আগে ফিক্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করো তারপর নির্জনে এবাদত করো।

মুবারক বিন ফুযালা হাসানের (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, কিছু লোক একটি গাছের পূজা করতো। তখন এক আবেদ গাছটির নিকট এসে বললো, আমি অবশ্যই এ গাছটি কেটে ফেলবো। তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ক্ষুব্ধ হয়ে গাছটি কাটতে উদ্যত হলে মানবাকৃতিতে শয়তান তার সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কী করতে চাও? আবেদ বললো, আমি মানুষের পূজিত এ গাছটি কাটতে চাই। শয়তান বললো, তুমি যেহেতু গাছটির পূজা করোনা সেহেতু মানুষের পূজায় তোমার কী ক্ষতি? আবদে বললো, আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, গাছটি আমি কাটবোই। শয়তান বললো, গাছ কাটার কোন সুযোগ আমি তোমায় দিব না। আবেদ বললো, আমি তা কাটবোই। এভাবে আবেদ, শয়তান যুদ্ধে লিপ্ত হলে আবেদ শয়তানকে ধরাশায়ী করে। শয়তান উপায়ান্তর না দেখে আবেদকে বলে, তুমি যদি গাছটি কাটা হতে বিরত থাকো তাহলে প্রতিদিন সকালে তোমার বালিশের নিচে দু'টি দীনার বিদ্যমান পাবে, যা দ্বারা নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে গরীব-দুঃখীদের সহযোগিতা করতে পারবে। আর গাছ কেটে কী লাভ? আজ একটি কাটবে, কাল লোকেরা দশটি লাগিয়ে সেগুলোর পূজা করবে। শয়তানের কথা আবেদের মনঃপূত হলে আবেদ শয়তানকে জিজ্ঞেস করে, দীনার আমার নিকট কোথা হইতে আসবে? শয়তান বললো, আমি নিজেই তার জিম্মাদার। আবেদ তথা হইতে প্রস্থান করে বাড়ীতে সকাল যাপন করলে শয়তানের ওয়াদা মোতাবেক বালিশের নিকট সে দু'টি দীনার বিদ্যমান পায়। অতঃপর দ্বিতীয় দিন আবেদ সকাল যাপন করে বালিশের নিকট কোন দীনার না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গাছটি কাটার জন্য উদ্যত হলে শয়তান পূর্বের ন্যায় মানবাকৃতিতে আবেদের সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করতে চাও? আবেদ বললো, আল্লাহকে

ব্যতীত লোকেরা যে গাছটির পূজা করছে আমি তা কাটতে চাই। শয়তান বললো, গাছটি কাটার কোন সুযোগ আমি তোমাকে দিবো না। আবেদ গাছটি কাটতে উদ্যত হলে শয়তান প্রহার করে আবেদকে ধরাশায়ী করে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়ে বলে, জানিস আমি কে? আমি হলাম অভিশপ্ত শয়তান। প্রথমবার তোর বুকে স্ফীত ক্রোধ আল্লাহর জন্য হওয়ায় তোর উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিলোনা বিধায় দু'দীনার দ্বারা আমি তোকে ধোঁকা দিয়েছি, ফলে তুই গাছ কাটা বর্জন করে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেছিস। কিন্তু দ্বিতীয়বার তোর ক্রোধের একমাত্র উৎস যেহেতু দীনার হারানোর বেদনা, তাই প্রভাব বিস্তারের সকল গায়েবী বাধা তোর উপর থেকে সরে গেছে এবং তোকে ধরাশায়ী করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

আবেদদের কতক এমন রয়েছেন, যারা পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে দীর্ঘ সময় টয়লেটে অবস্থান করেন, আর শয়তানও বিষয়টি তাদের নিকট উত্তম করে তোলে। অথচ টয়লেটে অবস্থান জরুরত পরিমাণে হওয়াই উচিত, কেননা দীর্ঘ সময় টয়লেটে অবস্থান কলিজার জন্য ক্ষতিকর।

আবেদদের কতক এমনও আছেন, যারা এস্তেঞ্জার পর হাঁটাহাঁটি, কাশাকাশি এবং পা-দ্বয় উঠানামা করেন। তাদের ধারণা, তারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জন করছেন।

শয়তান থেকে সতর্কতার জন্য কোরআনের নির্দেশনা

হাসান বিন সালেহ বলেন, শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ان الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبهٗ ليكونوا من اصحب السعير ﴿٦﴾

অর্থ:নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু;অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গন্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, নেক সুরতে ধোঁকাদিতে শয়তান বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তার কতক পন্থা এমন, যা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ হয়ে যায় কাবু, ফলে শয়তানের ধোঁকা হয় তার কাছে অস্পষ্ট, সে লিপ্ত হয় গুনাহে, বরবাদ করে তার দুনিয়া ও আখেরাত।

এবার শুনুন তার অন্য পন্থার বিবরণ, যা সাধারণ মানুষতো বটেই, বহু আলেমের নিকটেও তা অস্পষ্ট। এখানে শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকাদানের কিছু দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরেছি। যাতে উদাসীন ব্যক্তি হুঁশ ফিরে পায়, অনবগত ব্যক্তি অবগতিলাভ করে, আর অচেতন ব্যক্তি ফিরে পায় তার সম্বিত-চেতনা।

শায়খ আবুল ফরজ বলেন, মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, ইবলিসের কাজ হলো মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করা। সর্ব প্রথম আদমকে (আ.) সিজদার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে সিজদা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে উপাদান সমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে
গিয়ে বলে,

خلقتنى من نار و خلقته من طين

অর্থঃ হে প্রভু, আদমকে
সিজদার নির্দেশ এ কেমন অবিচার, অথচ তার সৃষ্টি-উপাদান মাটি,
আর আমার সৃষ্টি-উপাদান আগুন! অতঃপর মহাপ্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ উপেক্ষা করে বলে,

أرئيتك هذا الذى كرمت على

অর্থঃ আচ্ছা বলুনতো, কী কারণে আদমকে আমার উপর শেষ্ঠত্ব দান করলেন! অর্থাৎ আপনি যা করেছেন তা প্রজ্ঞাপূর্ন নয়, বরং তা প্রজ্ঞাশূন্য। অতঃপর সে দম্ভকরে ঘোষণা দেয়, أنا خير منه আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ।

অনন্তর সে নিবৃত্ত হয় সিজদা করা থেকে, ফলে সম্মান লাঞ্চিত করে।

সুতরাং শয়তান কোন বিষয়ে যখন প্ররোচনা দেয়, তখন মানুষের উচিত তার থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মন্দকাজের নির্দেশ প্রদানকালে তাকে লক্ষ করে বলা, তোমার নসীহত গ্রহণের পরিণামতো প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর অন্যের হিতার্থী ঐ ব্যক্তি কিভাবে হতে

পারে, যে নিজের হিত কামনায় উদাসীন। আর শত্রুর নসীহতে আস্থাবান হওয়া এতো নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এভাবে শয়তানের প্ররোচনা এড়িয়ে তাকে বলবে, আমার মাঝে অনুপ্রবেশের সকল ছিদ্রপথ তোমার জন্য বন্ধ।

এবার শুরু হবে নফসের চক্রান্ত, সে উদ্বুদ্ধ করবে প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে। তখন মানুষের কর্তব্য হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিণামফল আকল দ্বারা চিন্তা করা; তাহলে আশা করা যায়, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় ইচ্ছা আল্লাহর মদদে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করবে।

উপসংহার

আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে এবং পরকালে মুক্তি পাওয়ার মানসেই আমরা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে থাকি। কিন্তু আমাদের পরম শত্রু শয়তান কিভাবে যে চক্রান্ত করে এই পথে বাধা দিয়ে বিপথ এবং বিপদগামী করে তা আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। ফলে ইবাদত বন্দেগীতে পুণ্য লাভ হওয়ার পরিবর্তে জাহান্নামের পথই মুক্ত হয় বেশী। শয়তান এমন সূক্ষ্মভাবে তার কাজ করে যায় যে সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যা পাপ এবং অন্যায় শয়তান উহ্যই আমাদের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখায়। আল্লাহ ওয়ালা বিশিষ্ট আলেমগণই শয়তানের এইসব চক্রান্ত ধরতে পারেন।

শয়তান মানুষের জাতশত্রু। বিভিন্নরূপে চক্রান্ত করে সে আদম-সন্তানকে বিভ্রান্ত করবে। ধোকায় ফেলবে-এই প্রত্যয় সে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সরাসরি ব্যক্ত করেছে। সে নিজে এ কথাও বলেছে-
"কিন্তু হে প্রতিপালক। তোমার খাঁটি বান্দারা ব্যতিক্রমভুক্ত। তাদের উপর আমি পারঙ্গম নই।"

শয়তান তার সূক্ষ্ম চাল চালনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করে না। পাপ ও অন্যায়কে সে সুন্দর চাকচিক্যময় করে খাঁটিদেরকে ধোকাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। সূক্ষ্মদর্শীরা ব্যতীত শয়তানের এইসব চক্রান্ত অনুধাবন করা এবং এটা হতে আত্মরক্ষা সম্ভব হয় না।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

***নেক সুরতে শয়তানের ধোকা ১ম খন্ড- আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)**

***নেক সুরতে শয়তানের ধোকা ২য় খন্ড- আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)**

***শয়তানের থাবা আক্রমণ ও কৌশল- উস্তাদ নোমান আলী খান**

***ওয়াসওয়াসা শয়তানের কুমন্ত্রণা - ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)**

***শয়তান তোমার শত্রু- শাইখ খালিদ আর- রাশিদ**

*মনের অসুখ-মাওলানা ইলিয়াস হাসান

*আল কাউসার পত্রিকা

*তালবীসুল ইবলীস- ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ জাওযী (রহ.)